আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক

চিন্তাহরণ মজুমদার মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য

গবেষণার পথ-নির্দেশক

নীহাররঞ্জন রায়

বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রচারী সাধক

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র চৌধুরী রমেশ আচার্য

যতীন্দ্রনাথ রায় [ফেগা] সীতানাথ দে সতীশ সরকার দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়

স্মরণীয় শুভার্থী

কৈলাসচন্দ্র আচার্য

এঁদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বঙ্কিম মানস

মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ

শিল্পদৃষ্টি

ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক

রবীন্দ্র মানস

রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

আধুনিক উপন্যাসে মানবপ্রত্যয়

রেনেসাঁস ও সমাজমানস

মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার

ইংরেজী সাহিত্য পরিচয়

রামমোহন/উত্তরপক্ষ

Renaissance in Bengal ;

Quests and Confrontations

Renaissance in Bengal :

Search for Identity

ইত্যাদি ইত্যাদি

পূর্ব কথা

কয়েক বছর আগে—১৯৫৭ সনে—কবি-বন্ধু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার তিনটি ছোট মাপের প্রবন্ধ একত্র সংকলন করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন; নাম দিয়েছিলেন, 'সময় স্বদেশ মনুষ্যত্ব'। ঐ তিনটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর তুলনায় বই-এর নামকরণ অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর শোনালেও এর সঙ্গে আমার মনের আশ্চর্য মিল দেখতে পেয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, মিলটা মনোভঙ্গির, মানসিক অন্বেষণের। বরাবরই ভেবে এসেছি, সময়, স্বদেশ এবং মনুষ্যত্বের অন্বেষণে সর্বদা নিযুক্ত থাকাই তো জীবনচর্যা। যে মানুষ তার কালকে সত্য অর্থে জানতে চায়, দেশকে এবং দেশের মানুষকে সংবেদনশীলতায় সমগ্রভাবে উপলব্ধি করতে চায়, আর সে পথে আপন মনুষ্যত্বে পৌঁছুতে এবং ব্যাপ্ত হতে চায়, সে বেঁচে থাকে জীবনের গাঢ় ব্যঞ্জনায়। তাঁর বেঁচে থাকার কিছু না কিছু স্বাক্ষরও সে রেখে যায়, চিন্তায় কর্মে আচরণে।

সেই মিল আবিষ্কার করার দিন থেকে আমি 'সময় স্বদেশ মনুষ্যত্ব' এই নামকরণটিকে গোপনে লালন করে আসছি তুলনায় বড়ো কোন বই-এর নাম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। সেই সুযোগ আজ উপস্থিত যখন নিজেকে প্রতিদিন প্রশ্ন করছি, আমি বেঁচে ছিলাম কি? আমি বেঁচে আছি তো? বর্তমান গ্রন্থটির নামকরণের উৎস এই। সেজন্য বীরেনবাবুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সময় স্বদেশ মনুষ্যত্বের অন্বেষণ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সুতরাং আত্মজিজ্ঞাসাও। কিন্তু, আত্মজীবনী নয়। একজন সাধারণ অধ্যাপক-গবেষক-সমালোচকের জীবনে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা অধ্যায় নেই যা সম্পর্কে জনসাধারণ আগ্রহী হতে পারে; অথবা, তিনি স্বয়ং যাকে মূল্যবান বিবেচনায় এর বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন। সেজন্য, সরলরেখায় বিবর্তিত কাহিনী পাঠকের উপর চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা অর্থহীন। সেরকম কোন চেষ্টা এখানে নেই। তবু, ব্যক্তিগত জীবনের দু-চারটে ঘটনার উল্লেখ অনিবার্য। এ কারণে নয় যে, সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ; শুধু এ কারণে যে, এরা সময় স্বদেশ মনুষ্যত্ব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যাতে ঐ জিজ্ঞাসা সজীব ও প্রখর হয়ে উঠে, বোধকে উজ্জীবিত করে।

দশে পা দিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিলাম লেখাপড়া করার জন্য। ক্রমে

ক্রমে গ্রাম তো জীবন থেকে একপ্রকার মুছেই গেল। উৎস-মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। পরবর্তীকালে, বিচ্ছিন্ন মানসিকতা নিয়ে, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, অধ্যাপনা, গবেষণা, সমালোচনা, সমাজ-সংস্কৃতির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমাদের কালকে বোঝা এবং কালের আন্তর প্রেরণাসম্মত মনোভঙ্গি ও চরিত্র নির্মাণের কাজে ব্যস্ত থেকেছি; বলা যেতে পারে, আজও কোন-না-কোন ভাবে ব্যস্ত রয়েছি। সে কাজের মূল্য কি, তার বিচারক আমি নই, হতে পারি না। আত্মজিজ্ঞাসায় মুখর মুহূর্তগুলোতে অবশ্য এ কথা মনে না-হয়ে পারে না যে, আমার কাঙ্ক্ষিত কক্ষপথ থেকে আমি বিচ্যুত হয়েছি। তাই, যে ভাবে আমার বেঁচে থাকা উচিত ছিল, সে ভাবে বেঁচে থাকতে আমি ব্যর্থ হয়েছি।

প্রসঙ্গত স্মরণে রাখা ভাল, সময় বলতে যে কালসীমাকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে তার আরম্ভ ১৯৩০ থেকে, শেষ ঘটমান বর্তমান পর্যন্ত। এই সীমায় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে—বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর, এর অভিঘাতে সামাজিক জীবনও হয়েছে বিদীর্ণ, ছিন্নমূল, উদ্‌ভ্রান্ত। এই রূপান্তরের বহিরঙ্গ আমার উপলব্ধির বিষয় নয়, যেমন নয় রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। রাষ্ট্রীয়-সামাজিক বিস্ফোরণ ও আবর্তের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ছিল প্রচ্ছন্ন, এই কালে সঞ্চরণশীল মানুষের চিন্তা মনন কর্মে তার স্বীকৃতি ছিল কিনা, প্রত্যাশিত কর্মের উদ্‌বোধন ঘটেছিল কি না, না ঘটে থাকলে মানবিক দিক থেকে তার পরিণতি কী পরিমাণ মর্মান্তিক হয়েছে, সে চিন্তা আমাকে স্বভাবতই বিষণ্ণ করে। আমার ব্যক্তিগত ব্যর্থতা সমষ্টিগত ব্যর্থতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আবেদনে ব্যাপ্তিতে প্রখরতর প্রবলতর হয়। ছিন্নভিন্ন হই।

কিন্তু, এই ব্যর্থতার গ্লানি উত্তীর্ণ হয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন আত্মপ্রকাশ করে, প্রবল আত্যন্তিকতায়। সে সব প্রশ্নের উত্তর আমার দেশের মানুষকে এক সময় খুঁজে পেতেই হবে—বর্তমান প্রজন্মে যদি পাওয়া যায় তো ভাল, নইলে পরবর্তী প্রজন্মে। সেই প্রশ্নগুলোকে যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে পারার প্রয়াস এই গ্রন্থ।

অন্বেষণটা যেহেতু সম্পূর্ণ আত্মগত, প্রকাশে সেজন্য সঙ্কোচ অপরিহার্য। তবু, এই বই-এর পাঠকদের সংবেদনায় যদি ঐ অন্বেষণ সত্য হয়ে ওঠে, তাহলে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবো। অবশ্য, এ কথারও কোন প্রতিবাদ চলে না যে প্রেক্ষিতের বিভিন্নতা অনুযায়ী একই সমস্যার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হতে বাধ্য। তাই, অনন্যতার দাবি আমি করি না।

পাণ্ডুলিপি অবস্থায় এই গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি অধ্যায় পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্র ভারতীর সহকর্মী অধ্যাপক ডঃ ধীরেন দেবনাথ; কিছু কিছু অংশ পাঠ করেছেন আমার ভ্রাতা সুধাবিন্দু; শুধু মাত্র ষষ্ঠ অধ্যায়টি পাঠ করেছেন প্রাক্তন আন্দামান বন্দী হরিপদ চৌধুরী; প্রাথমিক খসড়ার কিছু অংশ পড়েছিলেন রঞ্জিৎ চক্রবর্তী। আর, কোন কোন অংশের পাঠ শুনেছিলেন ডঃ যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁরা সকলেই, নিজ নিজ প্রেক্ষিত অনুযায়ী, কিছু কিছু অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। সেইসব অভিমত কোন কোন অংশের পরিমার্জনায় সহায়ক হয়েছে। তাঁদের সকলকেই সাধুবাদ জানাই। আর সাধুবাদ জানাই এল-নাইন বাসের অজানা অচেনা মধ্যবয়সী সহযাত্রীটিকে, যাঁর মুখে 'সামাজিক কীটপতঙ্গ' কথাটির বিচক্ষণ ব্যবহার শুনে একদিন সকালবেলা চমকিত হয়েছিলাম। এই উক্তিটি আলোচ্য গ্রন্থের একটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক নিয়ে যাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম—তারাপদ লাহিড়ী, কিশোরীলাল দত্ত, অজিত মজুমদার, দীনেশ ঘটক, পৃথ্বীশ বাগচী, বনলতা চক্রবর্তী, প্রফুল্ল নন্দী, ধীরেন ধর, প্রবীর ঘোষ, সুখময় চক্রবর্তী, ননী ভট্টাচার্য, ইন্দু চক্রবর্তী, রূপক গুহ, কমলেন্দু ধর। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার উপলব্ধি এবং সিদ্ধান্তগুলো অধিকতর শাণিত হয়েছে, যদিও ঐ সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কিছু ছাপার ভুল থেকে গেল। অতিশয় লজ্জিত।

আর, এই গ্রন্থের প্রকাশক প্রীতিভাজন রণজিৎকুমার দেবের সহযোগিতা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিশেষ একটা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অতীত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ, সামাজিক আবর্তের স্বরূপ নির্ণয়, এবং ব্যক্তিক অবদানের মূল্যায়ন, ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে বর্তমানেরই অন্বেষণ। বর্তমান কালের জটিল ঘূর্ণাবর্ত থেকে যেসব সমস্যার সৃষ্টি, যে সংকটের উদ্ভব, সে সম্পর্কে সচেতনতাই এর উৎস সন্ধানে উৎসাহ যোগায়; এবং উৎস থেকে পরিণামে সমাধানের ইঙ্গিত।

এই দৃষ্টিতে ইতিহাসের অর্থ দাঁড়ায়, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক নিরন্তর সংলাপ। সেই সংলাপ তাৎপর্যমণ্ডিত হয় তখনই যখন অতীতের উন্মোচন বর্তমানকে উদ্ভাসিত করে।

আজ আমার কালের ব্যর্থ সায়াহ্নে উপনীত হয়ে সেই দৃষ্টিমার্গ থেকেই পেছনের দিকে তাকানো। আমার কালের ক্রম-উন্মোচনের মধ্যে, কৈশোরে, যে প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনাময়তার স্পন্দন অনুভব করেছিলাম, তা সফলতায় পূর্ণ হয় নি। বরং, তা বর্তমানে ক্ষীয়মাণ হতে হতে দ্রুত অবলুপ্তির পথে। বলা বাহুল্য, মানুষ এবং তার কর্ম-মনন-শ্রমের মাধ্যমেই কাল রূপায়িত হয়। সেই মানুষ কেন কালের স্থপতি হতে পারল না, বিভ্রান্ত হলো, ক্ষোভ, দুঃখ, লজ্জামিশ্রিত এই জিজ্ঞাসা আমার অপরাহ্ণের পৃথিবীকে বিষণ্ণ করে। আত্মজিজ্ঞাসায় চঞ্চল হই।

এই জিজ্ঞাসার পরিধি নিঃসন্দেহে সীমিত। কারণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এর চৌহদ্দি। কিন্তু, কালের উন্মোচনে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা যেহেতু একটি উপাদান,—বহু অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যা কালকে পূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় করে—সেহেতু তার দর্পণেও কালের একটি পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। আর সেই পরিচয়কে প্রতিনিধিত্বের মর্যাদাও দান করা যায় যদি তা অস্মিতার-ক্লেদবর্জিত হয়। ক্লেদটা লজ্জার, গ্লানির।

তবে, জিজ্ঞাসাটা ব্যক্তিগত বলেই ব্যক্তিকে প্রেক্ষাপটে সংস্থাপন

করতেই হয়। সেই সর্তে সায়াহ্ন থেকে কৈশোরে যাত্রা এবং কৈশোর থেকে পুনরায় সায়াহ্নে প্রত্যাবর্তন। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হবার পথে একটি অপরূপ চিত্র মনে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছিল। তুর্গেনিভের ১৮৮২-৮৩ সনে রচিত একটি গদ্য-কবিতায় তা অসামান্য সৌষ্ঠবে বিধৃত রয়েছে। সেটি এইপ্রকার—

...শোন তোমাকে বলছি—যে এই দেহ্‌লী পার হতে চাইছ, তুমি কি জান কী তোমার জন্য ওখানে প্রতীক্ষা করছে?

জানি। মেয়েটি উত্তর দিল।

শীত, ক্ষুধা, ঘৃণা, উপহাস, অবজ্ঞা, অপমান, কারাগার, ব্যাধি এবং মৃত্যু।

জানি; আমি প্রস্তুত, সব অত্যাচার-আঘাতই আমি সইব।

শত্রুদের আঘাত শুধু নয়, তোমার আপন জনের আঘাত, বন্ধুদেরও আঘাত।

হ্যাঁ, তাদের আঘাতও।

উত্তম। তুমি কি আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত?

প্রস্তুত।

পারবে সম্পূর্ণ নামগোত্রহীনভাবে আত্মবিসর্জন করতে? তুমি বিলীন হয়ে যাবে, আর কেউ জানবে না, কোন দিন কেউ জানবে না কাকে স্মরণ করে তারা শ্রদ্ধা জানাবে।

আমি কৃতজ্ঞতা চাই না, চাই না সমবেদনা। আমার কোন নামেরও প্রয়োজন নেই।

তুমি কি অপরাধ করার জন্যও প্রস্তুত?

প্রস্তুত, আমি অপরাধের জন্যও।

তুমি কি জানো, যে বিশ্বাসে আজ তুমি স্থিত তা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে, মনে হতে পারে তুমি ভুল করেছ, বৃথাই তোমার কচি জীবনটা জলাঞ্জলি দিয়েছ?

তাও জানি আমি। তবু আমি যাবো।

প্রবেশ করো।

মেয়েটি দেহলী পার হলো, আর তার পেছনে নেমে এলো একটা

ভারী যবনিকা।

মূর্খ! দাঁতে দাঁত ঘষে কে একজন মন্তব্য করল।

দেবতা! কোথা থেকে যেন প্রত্যুত্তরে শোনা গেল।

এই কবিতাটি সেই বয়সে আমি পড়ি নি, পড়েছি দীর্ঘকাল পর; তথাপি, এই পংক্তিগুলোর মধ্যে আমার তৎকালীন মানসচিত্রটি উজ্জ্বলতর রূপ লাভ করেছে বলে উদ্ধৃতির সহায়তায় নিজেকে ব্যক্ত করলাম।

কিন্তু আরম্ভের আগেও আরম্ভ থাকে। পেছনের দিকে তাকিয়ে সব কিছু যে সুস্পষ্ট দেখা যায় তা নয়। অনেকটাই অস্পষ্ট, অস্ফুট। তাছাড়া, আমার এবং আমার মত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে—নিছক গতানুগতিকতার মধ্য দিয়ে যারা বর্ধিত হয়—স্মরণীয়ই বা কি! কিছু স্নেহ-ভালোবাসা, কিছু অভিলাষ, অভাব, অবহেলা, সংস্কার, অশিক্ষা, ভাবনাহীন নিত্যনৈমিত্তিকতা, স্কুলে আসাযাওয়া, খেলাধূলা, আহার, নিদ্রা। বৈচিত্র্যহীন। এই গতানুগতিকতাকে কেউ ধরে রাখে না; এ এক নিষ্প্রাণ বোঝা।

তথাপি, এর মধ্য দিয়েও কাল প্রবাহিত হয়, সময় ঢেউ খেলে যায়। কোন কোন হৃদয় তাতে সাড়া দেয়, চঞ্চল হয়; কেউ কেউ সাড়া দিতে পারে না। যারা সাড়া দেয়, তাদের কারও চোখ সম্মুখে, কারও পশ্চাতে; আবার কেউবা সেই ক্ষণবিন্দুটিকে চিরন্তন ভেবে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে চায় কিন্তু পারে না। মনোভঙ্গির এই আবর্তে কি সংকেত লুক্কায়িত থাকে যা ভবিষ্যৎকে আলোড়িত করে অথবা এক অচলায়তনে স্থবির করে রাখতে চায়?

এই প্রশ্নটি নিয়ে এইক্ষণে যখন ভাবিত হচ্ছি, তখন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই উক্তিটি স্মরণে আসছে—আমার মৃত্যুর পর এই পৃথিবী ও মানুষের কী দশা হতে চলেছে সে বিষয়ে এই মুহূর্তেই চিন্তিত হওয়া উচিত, এবং আমার স্বীকৃত দায়িত্ব যদি কিছু থেকে থাকে তো তা অবশ্যই পালন করা উচিত। উক্তিটি এমন আত্যন্তিক এবং দীপ্তিময় যে আমার ক্ষুদ্র ভুবনও আলোকিত হয়। আমি প্রসন্ন হই। আণবিক

অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা সবিস্ময়ে স্মরণ করি। অনুভব করি, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-বিশ্বাস ইত্যাদির জগৎ নিয়ে প্রত্যেক মানুষই অনন্য—অবশ্য, এই অনন্যতা অন্য সব ভুবনের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলীয়ান হয়, সত্য হয়। হয় বাস্তব। কৈশোরের বাস্তব ও ভবিষ্যৎ আজকের অতীত। সেই অতীত থেকে বর্তমানে প্রত্যাবর্তনের পথে নিজেকে নতুনতরভাবে জানা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্পন্দন উপলব্ধি করা। সময়ের তরঙ্গে সচকিত হওয়া।

কৈশোরের একটি স্বপ্ন, স্বপ্ন না বলে আবেগমণ্ডিত আকাঙ্ক্ষা বলাই বোধ করি সঙ্গত, আমাকে দীর্ঘকাল উদ্দীপ্ত রেখেছিল। আজও সায়াহ্নের চিন্তাকুল মুহূর্তগুলোকে সে ভরে দেয়। বলা বাহুল্য, পৈতৃক ভদ্রাসন ছিল শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী একটি ছোট্ট গ্রামে। নিকটতম রেল স্টেশন তিন-সাড়ে তিন মাইল। ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা উঁচু সড়ক ছিল মাইল দুই, মধ্যে গোটা তিনেক ভাঙ্গা কাঠের সেতু। গ্রীষ্মকালে তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া চলত, আর বাকী পথটুকু সরু প্রায়-শুকনো খালের পাড় ধরে বা ক্ষেতের আল ধরে অগ্রসর হতে হতো। কল্পনা করা যাক, বছর তের বয়সের একটি কিশোর দুপুরের কাছাকাছি ময়মনসিংহ সহর থেকে ট্রেনে চেপে পড়ন্ত বিকেলে গাড়ি থেকে নামল। হাতে ইঞ্চি কুড়ি লম্বা একটি টিনের স্যুটকেস। সামান্য জামাকাপড় ও বইপত্তর। দিনের আলো ফুরুতে ফুরুতে ত্রস্ত কিন্তু ক্রমেই ক্লান্ত-হতে-থাকা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে সড়ক থেকে ক্ষেতের আল ধরল। অন্ধকার দ্রুত ঘনিয়ে আসছে, অবসন্ন দেহে ভয় নামছে। ক্ষেত পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে দূর-দূরান্তের গ্রামগুলো থেকে মিটমিট আলোর বিন্দু হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যেত। বিপরীত দিক থেকে আসতে-থাকা এক-দুই জন মানুষ ছায়ামূর্তির বিভীষিকা নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেত। ভয়ে বিবশ মৃত্যু যেন আসতে আসতেও এলো না। আর ঠিক তক্ষুনি মনে জাগত এই উদ্বেল আশা—

ভুবন পরিব্যাপ্ত এই অন্ধকার কি দূর করা যায় না? কিশোর বুদ্ধিতে

এর সমাধানও ছিল রেডিমেড। পাকা রাস্তা বানিয়ে গ্রামকে যদি গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, আর রাস্তাগুলোকে বৈদ্যুতিক আলোর মালায় সাজিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই তো অন্ধকার যাবে পালিয়ে, আর আলোয় আলোয় গ্রাম সহরের মতই সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। বৈদ্যুতিক আলোয় পথচলা এবং লেখাপড়া করতে অভ্যস্ত একটি কিশোর চিত্তে এই ভাবনা ছিল স্বাভাবিক। এই সহজ ভাবনাটি গভীর অর্থব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠে যখন অনুভব করি, এর পশ্চাতে ছিল কালের অচেতন ঈশারা, ভবিষ্যতের সংকেত ও দাবি।

কিন্তু, ভাবনাটা যত প্রবল তার সমাধান কিন্তু, বাস্তবিক তত সহজ নয়, নিদারুণ কঠিন। কারণ, সমস্যাটা নগরায়নের, অর্থাৎ গ্রামকে সহরে রূপান্তরিত করার সমস্যা ; এবং এভাবে গ্রাম ও সহরের অস্তিত্বের ব্যবধান হ্রাস করা, সর্বশেষে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দেওয়া। সমস্যার দুরূহ জটিলতা আজ বুঝি, সেদিনের আকাজ্ক্ষার অতিশয়তায় বুঝি নি। শুনেছি, পূর্ব বাংলায়—বর্তমান বাংলাদেশে—পথঘাটের বিস্তৃতি ও উন্নতি হয়েছে বিপুল ; নতুন নতুন প্রশস্ত রাস্তা সমগ্র রাষ্ট্রকে করেছে পরিবহণযোগ্য। যে ছোট্ট গ্রামে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, তা অন্য গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কিনা অথবা তা বিদ্যুৎ-রশ্মিতে ঝলকায় কিনা, কোনদিন ঝলকাবে কিনা জানি না। কিন্তু, স্বপ্ন তো মৃত্যুহীন, কেউ তাকে হত্যা করার ক্ষমতা রাখে না।

প্রশ্ন জাগে, ঐ আকাজ্ক্ষা কি দেশপ্রেমের প্রথম অঙ্কুর? না, নিশ্চয়ই না। তা ছিল একটি কিশোরের একান্ত আপনার, স্বার্থপর চিন্তা ; তার আসা-যাওয়ার পথকে নির্ভয় নিরাপদ করার একান্ত তাগিদ। দেশপ্রেমের অথবা পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদী বৈপ্লবিক তত্ত্বের আনুষ্ঠানিক পাঠ আমি কখনও গ্রহণ করি নি, সেরূপ অবকাশ আসে নি। যা পেয়েছি তা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল, ছড়ানো-ছিটানো, এবং অপরিণত। তা খেলার মাঠের কলকাকলি অথবা কোন নিভৃত সংলাপ থেকে আহরিত। যার একান্ত সংলাপ আমার চিত্তকে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রসারিত

করার জন্য চেষ্টিত ছিল, সে তখনও স্কুলেরই ছাত্র, উপরের শ্রেণীর। পরে দেখেছি, তার বাড়িতে প্রায়শই তল্লাসী, থানায় তলব, ইত্যাদি। তারও পরে তাকে আর দেখতে পেলাম না। অন্তরীণ কি গ্রেপ্তার হয়েছিল, ঠিক স্মরণে নেই। আরও দু-চার জনের সঙ্গে এভাবে সংযুক্ত হয়েছিলাম, ব্যায়ামের আখড়ায় যাতায়াত করেছিলাম কিছুদিন, পুলিশ তা ভেঙ্গে না-দেওয়া পর্যন্ত। এই যোগাযোগের ফলশ্রুতি এই হয়েছিল যে, কিছু সংখ্যক নিষিদ্ধ বই অল্প বয়সে পড়তে পেরেছিলাম।

আমার বন্ধুরা নিজেদের অনুশীলন সমিতির সদস্য বলে পরিচয় দিত। তারা কি ধরনের দীক্ষা লাভ করেছিল আমার জানা নেই; আমি কিন্তু কোন দীক্ষা পাই নি। এবং প্রত্যক্ষ কোন কর্মের দায়িত্বও আমার উপর বর্তায় নি। যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলার বুকে এণ্ডারসনী অত্যাচার-নিপীড়ন বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে; বৈপ্লবিক আন্দোলন তখন ভয়ংকরের পথ চিরকালের মত বর্জন করার মুখোমুখি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। এরই মধ্যে ১৯৩৪ সনের গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং-এর লেবং-এ এণ্ডারসন হত্যাপ্রচেষ্টায় বৈপ্লবিক কর্মের স্ফুলিঙ্গ শেষবারের মত জ্বলে নিভে গেল। অনুশীলন ও অন্যান্য বৈপ্লবিক গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বন্দী শিবিরে অথবা আন্দামানে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন; অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ তখন কারাগারের বাইরে। সংগঠন ও যোগাযোগ বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম অথবা সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রশাসন কাঠামোয় ক্ষত সৃষ্টি করার উপায় বা সুযোগ কোনটাই ছিল না; ঐরূপ কার্যক্রম রূপায়ণে উপযুক্ত নেতৃত্বেরও অভাব ছিল। সুতরাং ঐ সময়ে যারা আমারই মত সমিতির সংস্পর্শে এসেছে, তাদের আমি সমিতির শেষ বয়সের সন্তান বলেই ভেবে এসেছি। সমিতির কর্মকাণ্ডে তাদের অবদান শূন্য। কর্ম বা চিন্তায় কোনও ভাবে এক ফোঁটা শিশির দান করেছি, এ দাবিও অসঙ্গত। কারণ সে সুযোগই ছিল না, ছিল না কর্মের আহ্বান।

তবে, রাজনৈতিক শিহরন ছিল তখনকার হাওয়ায়। ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের দুই-দুইটা উত্তপ্ত বছর পার হয়েছে। এরই

আরম্ভে গ্রাম থেকে ময়মনসিংহ সহরে পড়তে এসে নতুন এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি—হাজার হাজার মানুষের, ছেলে-মেয়ে-মহিলা-পুরুষের, সুদীর্ঘ মিছিল। অধিকাংশের পরনে খদ্দর, মাথায় গান্ধী টুপি, মুখে বন্দেমাতরম ধ্বনি আর 'ডাউন ডাউন ইউনিয়ন জ্যাক আপ্ আপ্ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ' আকাশ-বিদীর্ণ-করা স্লোগান। সাদা মুখের সাক্ষাৎ পেলেই 'শেম' 'শেম' চিৎকার ও ধিক্কার। আমার গ্রামীণ খাল-বিল-মাটি-গোবরের গন্ধলাগা চোখে এ দৃশ্য অভিনব।

তার চেয়েও অভিনব ও বিস্ময়কর লেগেছিল অপর একটি অভিজ্ঞতা—পিকেটিং। যে সময়কার কথা বলছি তখন ময়মনসিংহের রাস্তায় পীচ ঢালা হয় নি; ইট সুরকির পাকা রাস্তা তেমন খারাপ ছিল না অবশ্য। সরকারী অফিস, আদালত, মদের দোকান, ইত্যাদির সম্মুখে পিকেটিং-এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হতো। বুকে একটু আধটু সাহস সঞ্চয় করে দু-তিন দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেছি। অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি, কী দুঃসাহসে তরুণেরা অবলীলায় নিজেদের রাস্তায় বিছিয়ে দিয়েছে যাতায়াতেব পথে অবরোধ সৃষ্টির জন্য। পুলিশের লাঠি, লাথি, কিলচড় নেমে এসেছে তাদের উপর; হয়েছে ধরপাকড়, কিছুক্ষণ ছত্রখান অবস্থা। একটু বাদেই অন্য একদল নিজেদের ছড়িয়ে দিল রাস্তায়, তেমনি অবলীলায়, নির্ভয়ে। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। আবারও। আবারও। কিশোর মনে বিস্ময়ের তরঙ্গ।

আমাদের ব্যবসায়ী পরিবারের বাসস্থান ছিল একটি বাজার সংলগ্ন। পরিবেশটা বাঞ্ছিত ছিল না; মানসিক অথবা দৈহিক বৃত্তির সাবলীল স্ফুরণের পক্ষে তা অনুকূলও ছিল না। আমাদের বাসস্থানের কাছেই ছিল ছোট্ট একটি ধাঙ্গড় বস্তি, দু-তিনঘর বাদ্যকর, একটি মদের দোকান, এবং আশেপাশে, রাস্তার এপারে ওপারে, কিছু সংখ্যক গণিকা। একটা বিশ্রী কলরব সমগ্র পরিবেশকে বিবর্ণ বিস্রস্ত করে রাখত।

একদিন শুনতে পেলাম, ঐ মদের দোকানে পিকেটিং নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে। গেলাম দেখতে। গণ্ডগোল যা হবার আগেই সম্ভবত হয়ে

গিয়েছিল। তখন তেমন কিছু ভীড় ছিল না। দোকানের দুটো দরজার সামনে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক মদ্যপিপাসুদের বাধা দিচ্ছিল, এবং বোঝানোরও চেষ্টা করছিল যে, মদ্যপানটা গর্হিত। যাদের দৈহিক দাপট বেশি, তারা এসব অনুরোধ-উপরোধে আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল, আর যারা ঈষৎ মৃদু স্বভাবের তারা আপাতত দূরে সরে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করছিল। একটু বাদে শ্রমজীবী শ্রেণীর একটি দল সেখানে উপস্থিত হলো। স্বেচ্ছাসেবকদের অবরোধ এবং অনুনয়ের উত্তরে দলটি সদর্পে বলতে লাগল যে ঐ বস্তু তারা কখনও স্পর্শই করে না, তারা এসেছে নিছক দর্শক হিসেবে, ওদের কাজের তারিফও করল। কিন্তু চলে গেল না, এদিক সেদিক ছড়িয়ে রইল। নিশ্চিন্ত স্বেচ্ছাসেবকেরা স্বভাবতই একটু অসতর্ক হয়ে পড়ল। আর যেই না অসতর্ক হওয়া অমনি ঐ দলটি ঝড়ের বেগে দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়ল। হতভম্ব স্বেচ্ছাসেবকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল; এপার ওপারের গণিকারা হেসে উঠল খিলখিল করে।

ঐ শ্রমজীবী দলটির আচরণ সেদিন আমাকে কম বিস্ময়াবিষ্ট করে নি। বারে বারে, এবং বহু দিন ধরে, আমার মনে হয়েছে কী সুনিপুণ ধাপ্পা, কথায় আর কাজে কি নির্লজ্জ ফারাক। পরবর্তী কালে কৈশোর পার হয়ে, ব্যবহারিক জীবনের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় লাভ করে দেখেছি, ধাপ্পাটা তেমন কিছু নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। এমন কি, বৈপ্লবিক আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ বলে পরিচিত ব্যক্তিরাও বৈপ্লবিক তত্ত্বকে একটি বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করতে পেরেছেন অবলীলাক্রমে; এবং পণ্য কেনাবেচার মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে দিচ্ছেন নিপুণতর ধাপ্পা। সময় যখন এমনিভাবে আন্দোলিত হতে আরম্ভ করেছে তখন অকস্মাৎ এক সন্ধ্যায় সংবাদ পাওয়া গেল, সহরের এক প্রান্তে মদের ডিপোর সামনে না কোথায় পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের উপর গুলি চালিয়েছে। মৃত একাধিক, আহত অনেকে, এবং গ্রেপ্তার অধিকতর। কেমন একটা কণ্ঠহীন নিস্তব্ধতা নেমে এলো সহরের বুকে, সর্বত্র কেমন যেন অসহায়

ভয়কম্পিত বেদনা, বড়োদের মধ্যে ফিসফাস কথাবার্তা। পরদিন কার মুখ থেকে যেন এই মন্তব্যটি শুনে সচকিত হয়ে উঠলাম—নিজের জন্য না, বাপমায়ের জন্য না, দেশের জন্য প্রাণ দিল! কথাটা আমার অন্তর্লোকে গুঞ্জরিত হলো কিছুদিন। আর, তখন থেকেই সম্ভবত, অজ্ঞাতসারে, তুর্গেনিভের পূর্ব-উদ্‌ধৃত প্রতিমাটির মত একটি রূপবর্ণময় চিত্র আমার মানসপটে রচিত হতে আরম্ভ করেছিল।

মনের বিচরণ ক্ষেত্র কিন্তু তেমনকিছু প্রসারিত হয় নি। যতদিন স্কুলে ছিলাম ততদিন না। প্রবেশিকা পাশের পর আমার পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক কূপমণ্ডুকতা নিয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে আসার পর তৎক্ষণাৎ অনুভব করলাম, আমার অনুভব-বোধ-বুদ্ধি-অধ্যয়ন এবং সংবেদনার জগৎ কত ক্ষুদ্র, কত সীমিত। থাকতাম ক্যানিং হোস্টেলে, বর্তমানে গিরীশচন্দ্র ছাত্রাবাস। সহপাঠী এবং সহবাসীদের অধিকাংশই ছিল এমনসব পরিবারের সন্তান যারা আধুনিক তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির দাক্ষিণ্য হৃদয়ভরে গ্রহণ করেছে। এই ছেলেদের চলনে বলনে ব্যবহারিক বোধে ছিল এমন একটা প্রখরতার দীপ্তি যা আমাকে মুগ্ধ করত। তাদের মুখে শুনতাম এমন সব নাম যা আমার কৈশোরের স্বল্প পরিসর ভুবনে কখনও উচ্চারিত হয় নি। মানবিক অভিব্যক্তির নানান ক্ষেত্র থেকে আহরিত সেসব নাম—সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, সিনেমা। একটা হীনমন্যতার বোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে।

মনের এই সঙ্কুচিত অবস্থায় একদিন বিকেলে কলেজ স্ট্রীটের চক্রবর্তী-চ্যাটার্জীর বই-এর দোকানে শো-কেসে রক্ষিত একটি বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে। 'আই উইল নট রেস্ট'। নির্বোধ ইংরেজি বানানে লেখকের নামটি অতিশয় বিদ্‌ঘুটেভাবে উচ্চারণ করেছিলাম—জনৈক সহপাঠী পরে আমাকে সংশোধন করে জানিয়েছিলেন, লেখকের নাম রোমাঁ রোলাঁ। বইটি সেসময় পড়তে পারি নি, পড়েছি পরে। কিন্তু ঐ মুহূর্ত থেকেই

গ্রন্থের নামটি এক অবিনশ্বর দ্যোতনায় আমার মনে চিরদিনের মত গ্রথিত হয়ে গেল। কোথায়ও থেমে থাকব না আমি, কোন কিছুতেই না, চলতে থাকব, চলতেই থাকব শুধু···। পরবর্তী কালে আমাদের স্বদেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রকারদের উপদেশ 'চরৈবেতি চরৈবেতি'-র সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত হয়েছি, জেনেছি, চলতে থাকাই জীবন, থেমে যাওয়াই মৃত্যু ; সুতরাং এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। এ যেন আমার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পর জাগরণের অবস্থা। একটি ধ্রুপপদে যেন স্থিতিলাভ করেছি। মানব অভিযানের নিগূঢ় বাণীই তো এই—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

নিমেষে আমার ক্ষুদ্র সত্তা যেন নক্ষত্রলোক স্পর্শ করতে চাইল। আনন্দ হলো খুব। আর শিহরন। কলেজের পঠনপাঠনে অনুরাগ গেল দারুণভাবে কমে। মন তখন শুধুই পথিক হতে চাইছে, ভাবের জগতে। কলেজে যাতায়াতও কমে গেল। পথিক মনকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার সময় কাটত। রাত্রিতে প্রায়ই ঘুম আসত না। নতুন-পড়া কোন বই-এর বিষয়বস্তু, নতুন-চেনা কোন ভাবাদর্শ—বিশেষ করে বার্ণার্ড শ'র নাটকগুলো—তীব্র উত্তেজনায় দেহমনকে তাতিয়ে রাখত।

কোন কোন সময় গভীর রাত্রি পর্যন্ত নিজেকে নিয়ে নির্জনে একাকী বসে থাকতাম। ক্যানিং হোস্টেলে ঢুকে ডান দিকের সারিতে দোতলায় একটি ঘরে নির্দিষ্ট ছিল আমার আশ্রয়—আরও দুজন সহপাঠীও থাকত। দোতলার ঘরগুলোর মধ্যবর্তী বারান্দার শেষ প্রান্তে—রাস্তার দিকে—খানিকটা অলিন্দের মত ছিল ; হয়তো এখনও আছে। নিদ্রাহীন রাত্রিতে ঐখানে চুপচাপ বসে থাকতাম। অন্তরে হাজার হাজার জিজ্ঞাসা। সমস্ত চরাচর নিস্তব্ধ, নিঝুম। জ্যোৎস্নাহীন রাত্রিতে অন্ধকারে ঘেরা কলকাতার আরেক রূপ চোখে পড়ত। তখনকার দিনে হাল আমলের মত আলোর রোশনাই ছিল না, ছিল না গগনবিদারী বড়ো বড়ো সব অট্টালিকা। নির্বাধ দৃষ্টি ছড়িয়ে যেত অনেকটা দূরে—গভীর নৈঃশব্দ্যের রাত্রিতে অন্ধকার চিরে দূরাবস্থিত একটা বাড়ির দোতলার

বারান্দা থেকে একটা ক্ষীণ বৈদ্যুতিক বালবের আলো আমার চোখকে স্পর্শ করত। পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে ঐ ক্ষীণ আলোয় অস্পষ্ট আভাসিত বাড়ির রূপরেখা একটা জাহাজের মূর্তি ধরে আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠত—যেন সমুদ্রাভিসারে যাত্রায় উন্মুখ। উদভ্রান্ত মন আমার সমুদ্রাভিসারের সঙ্গী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হত। এই চাওয়ার সংগোপন নিভৃত আনন্দ যে কত রাত্রি ভোগ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। পেছনের দিকে তাকিয়ে আজ মনে হয়, ঐ জাহাজের প্রতীকে ভেসে-আসা বাড়িটা সম্ভবত একটা সংকেত বহন করছিল। সেটা পাতা বদলের, রূপান্তরের।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ তখন পালা বদলের দাবিতে অধীর। সেই অধীরতা সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিত্বে মূর্ত হয়েছিল; তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এবং গণ-সংগঠনগুলো। কিন্তু ইতিহাসের চ্যালেঞ্জ তো সব হৃদয় গ্রহণ করতে পারে না। তাই, দেশে রূপান্তর-বিরোধী শক্তিরও অভাব ছিল না; ছিলেন গান্ধীজী ও তাঁর সহযোগবাদী অনুচরবৃন্দ, ছিল দুই জাতি তত্ত্ব। সুতরাং, সেই অধীরতা শেষ পর্যন্ত সঠিক রাস্তা পেল না, গুমরে গুমরে মরল। বাইরের এই আলোড়নের সঙ্গে আমার আপন হৃদয়ের চাঞ্চল্যকে এক সূত্রে বাঁধতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু তা দু-চারটে গান্ধী-বিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণে নিঃশেষিত হলো।

পরিবর্তন কিন্তু সত্যি এলো। ইতিহাসের আবর্ত সম্পর্কে এঙ্গেল্‌স্ যা বলেছেন সেই সূত্র অনুসরণ করে এই পালা বদলের মুহূর্তগুলোকে সুন্দর ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর বিশ্লেষণ—বহু মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, কর্ম চিন্তা ভাবের গতি, ইত্যাদি যখন একই সামাজিক পরিমণ্ডলে আবর্তিত হতে থাকে তখন নির্মিত হয় বিচিত্রতর জটিলতর অস্থিরতর আর এক আবর্ত। এই আবর্ত নির্বিশেষ, যা সামগ্রিক হয়েও কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত নয়, যা সকলের হয়েও বিশেষ কোন

ব্যক্তির নয়। সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত এই সব ছোট ছোট আবর্ত আমাকে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে, এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্তে উৎক্ষেপ করে জীবনের লক্ষ্য ও প্রবাহ সম্পূর্ণ অদলবদল করে দিল। এবং দিল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে, অনিবার্যতার দুর্বার গতিতে। সংক্ষেপে সে ইতিহাস নিম্নরূপ।

ঝোঁকের মাথায় দুই সহপাঠীর সঙ্গে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলাম, কিন্তু হলো না। অতিশয় তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একজনের সঙ্গে মনোমালিন্য এমন এক দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় পর্যবসিত হলো যে পড়া ছেড়ে দিয়ে ঐ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভ করতে হলো। ফিরলাম। এক বছর প্রথাগত বিদ্যাভ্যাস থেকে দূরে থাকলাম; অন্য দিক থেকে ক্ষতিপূরণ হলো—সাহিত্যপাঠের দিগন্ত বিস্তৃততর হলো এবং মার্ক্সবাদী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হলো ঘনিষ্ঠতর। রাজনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণের মাত্রাও বাড়ল, এবং অবশেষে কলেজে ফিরলাম আগের মত বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে নয়, সাহিত্যের ছাত্ররূপে।

১৯৪৬ সনের জুন মাস। কয়েক মাস আগে জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছি। দলীয় [আর-এস-পি] সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত ও মজবুত করার কাজ চলছে। মহাত্মা গান্ধী রোডে অবস্থিত মহেন্দ্র দত্ত'র ছাতার দোকানের দোতলায় একটি কোণের ঘরে আমাদের কয়েকজনের বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। একদিন সকালবেলা কোন কারণহীন কারণে আমার মন প্রথম যৌবনের পথিক হবার বাসনায় উদ্‌ভ্রান্ত। ঘরে তখন ছিল বিজন বিশ্বাস, প্রতুল চৌধুরী (দলীয় কাজে তিনি নোয়াখালি থেকে কলকাতা এসেছিলেন) এবং আরও দু-একজন। আমার উন্মনা ভাব প্রত্যক্ষ করে প্রতুলদা বললেন, চলুন, অরবিন্দবাবু, আমাদের নোয়াখালি, আপনাকে একটা স্কুলের হেডমাস্টার বানিয়ে দেব। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে আপনার সাহিত্যচর্চা ফলপ্রসূ হবে। বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

অকস্মাৎ কি মনে করে বিজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিজন, এম-এ পরীক্ষার আর কতদিন বাকি ?

—এম-এ তো জুলাই মাসে হয়। মাস খানেক বা তার কিছু বেশি হবে। কেন?

—পরীক্ষা দেব ভাবছি।

—সেকি! মাথা খারাপ! ফি-টি জমা দেবার শেষ দিন কবে পার হয়ে গেছে, পারমিশন পাবে কি করে?

—তোমরা ছাত্র-আন্দোলন কর কি জন্যে? একটা স্পেশাল ব্যবস্থা করতে পারবে না? প্রস্তুত হও, আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কিছুক্ষণ বাদেই প্রতুলদা ফিরলেন। ঘরে ঢুকতেই আমি সাগ্রহে বলে উঠলাম, প্রতুলদা, আপনি আমাকে হেডমাস্টার বানাতে চেয়েছিলেন, জানেন আই অ্যাম গোয়িং টু বি আ প্রফেসর?

—কি রকম?

—এইমাত্র সিদ্ধান্ত নিলাম এম-এ পরীক্ষা দেব।

তারপর ছাত্র নেতাদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রায় জবরদস্তি করে অনুমতি আদায়, ঋণ করে ফি সংগ্রহ, যথাসময়ে পরীক্ষায় বসা এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া। সমগ্র ব্যাপারটা এমন অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সংঘটিত হয়ে গেল যে আমার সহকর্মীদের অনেকেই আমার এম-এ পাশ ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

১৯৪৮ সনে সেপ্টেম্বর মাসের কোন এক সকাল। তখনও আমি দলের সর্বক্ষণের কর্মী, অবস্থান দলীয় সদর দপ্তরে। অন্যান্য দায়প্রাপ্ত কাজকর্মসহ দলের সাংস্কৃতিক মুখপত্র 'ক্রান্তি'-র তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করছি, এবং আমার ব্যক্তিগত আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য দৈনিক সংবাদপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা'-র বার্তা বিভাগে সাব-এডিটর পদে কাজ করি। সে সপ্তাহে আমার ডিউটি ছিল নৈশ বিভাগে। রাত্রি তিনটা নাগাদ কাজকর্ম শেষ করে ঘণ্টা তিনেক আধো-ঘুম আধো-বিশ্রামের মত কাটিয়ে সেখান থেকেই ছুটলাম ড. নীহাররঞ্জন রায়ের বাড়ি। 'ক্রান্তি' সংক্রান্ত কি একটা জরুরী প্রয়োজন ছিল।

গিয়ে দেখি, তিনি এক ভদ্রলোকের পাণ্ডুলিপি বিচারে উদ্ব্যস্ত। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, তথ্য সন্নিবেশ, যুক্তির সোপান, গদ্যরীতির পরিশীলন, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি করে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়েও দিচ্ছিলেন ভাষার পরিমার্জনা ও উপস্থাপনার উৎকর্ষ কিভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব। আমি ঘরের প্রান্তে চুপচাপ বসে। ইতিমধ্যে চা-টোস্ট এলো, খেলাম। একাধিক খবরেরর কাগজ আদ্যোপান্ত পড়লাম। ওঁদের পর্যালোচনা আর শেষ হয় না, ঐ ভদ্রলোকটিরও উঠবার বিন্দুমাত্র গরজ লক্ষ্য করলাম না। সময় যাচ্ছে, রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি অনুভব করতে আরম্ভ করেছি ; ঐ মানুষটির উপর বিরক্ত—ক্রমে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছি। ফিরেই যাব কিনা ভাবতে আরম্ভ করেছি, কিন্তু যেতে হলো না, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লক্ষ্য করলাম পাণ্ডুলিপি বাঁধা হচ্ছে। নীহারদা ডাকলেন আমাকে।

ইনি চলে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাঁর পরিচয়, পেশা, গবেষণার বিষয়বস্তু, ইত্যাদির বিবরণ জানতে পারলাম। এরপর সুরু হলো আমাদের প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা। বলতে বলতে হঠাৎ নীহারদা বলে বসলেন, তুমিও একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা কর না কেন ? বললাম, গবেষণা করব আমি ? বলেন কি ? দলীয় কাজ, 'ক্রান্তি,' সংবাদপত্রের চাকুরি—এত সবের পর আমার অবসর কোথায় ? গবেষণা তো অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার, ও আমার সাধ্যের অতীত। তাঁর জেদ—আমি পারব ; আমার প্রতিবাদ—পারব না। প্রায় দশ মিনিট হবে এবং হবে না, এই বাদ-প্রতিবাদী উচ্চারণে আমরা মুখর হয়ে রইলাম। পরক্ষণেই অনুভব করলাম, তাঁর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ জোর লাগল আচমকা। বললেন, আমি বলছি তোমাকে করতেই হবে। শুনে আমার প্রতিরোধ চৌচির হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। বললাম, কথাটা যদি এভাবে বলেন তো আপনার অবাধ্য হবার শক্তি কোথায় আমার ? কি করতে হবে বলুন। এবার তাঁর কণ্ঠস্বরে কৌতুককর বিদ্রূপের ছোঁয়া,—কিছুই করতে হবে না, শুধু দয়া করে কাল সকালে আবার এখানে আসবেন।

গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবেদনপত্র তিনি স্বয়ং নিয়ে এসেছিলেন। সেটা পূরণও করলেন তিনি, আর গবেষণার বিষয়বস্তুর জায়গায় স্বীয় হস্তাক্ষরে লিখলেন 'বঙ্কিম মানস'। তারপর অন্য একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, দস্তখত করো। করলাম। পকেট থেকে দশ টাকার একখানা নোট বের করে নির্দেশ দিলেন, সাহিত্য পরিষদে যাও, সদস্য হও, পুথিপত্র যা লাগে নিয়ো। অসুবিধা কিছু হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। আর, আমার এই বইপত্র, তোমার যা লাগবে, সব নিয়ে যেও। আমার ভীরু জিজ্ঞাসা, কিন্তু ফর্মটা ? সে দায়িত্ব আমার, বললেন। অর্থাৎ, আবেদনপত্রখানা জমাও দিলেন তিনি।

সেদিনকার মত উঠলাম, বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে। তার আগের দিনের ঘটনার কথা মনে পড়ল। সেই ভদ্রলোক, যাঁর প্রতি বিরক্তিতে প্রাণ ভরে উঠেছিল কিন্তু যিনি এতসব কাণ্ডকারখানার প্রত্যক্ষ হেতু, তিনি হলেন ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। অভাবনীয় এক ভাবাবর্তের স্রষ্টা, কালের আয়ুধ, আমার ডক্টরেট ডিগ্রীর অসচেতন প্রেরণা।

আজ ভাবি, এমন সুদুর্লভ সৌভাগ্যের মুহূর্ত কারও জীবনে কখনও এসেছে কিনা জানি না। স্নেহপ্রীতির দাক্ষিণ্য এভাবে আমার উপর বর্ষিত না হলে 'বঙ্কিম মানস' সম্ভবত কোন দিনই রচিত হতো না। আর এমন নিঃস্বার্থ ঔদার্য তো তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি সংবেদনায় মানুষকে কাছে টানেন, তাকে প্রতিষ্ঠার পথ ধরিয়ে দেন। ফেরার পথে মনে পড়ল মাস্টার মশাই-এর কথা; মাস্টার মশাই, অর্থাৎ নীহারদার পিতা, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, আমার স্কুলের শিক্ষক, যাঁর অতিশয় সরস পঠনপাঠন এবং স্বাধীনচিত্ততা আমাকে নিক্ষেপ করত বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরে, দিত বৃহত্তর পৃথিবীর আস্বাদ।

অনবসরের মধ্যেও খানিকটা অবসর খুঁজে গবেষণার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, পড়াশুনায় ঈষৎ অগ্রসরও হয়েছিলাম। আর তক্ষুনি ঘটল সেই অকল্পনীয় বিপর্যয় যে বিপর্যয় ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় মুহূর্তের জন্যও কখনও বিচলিত হই নি। অর্থাৎ, দলীয় রাজনীতি থেকে বিদায়।

কেন এই বিপর্যয়, নির্মোহ দৃষ্টিতে তৎকালীন দলীয় পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করলে এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে আমি স্থিত হই যে, আমার পরিপ্রেক্ষিত নির্ভুল ছিল। সম্ভবত দলের অভ্যন্তরে আদর্শগত সংগ্রাম উজ্জীবিত রাখার ক্ষমতা আমার ছিল না, ছিল না নেতৃত্বদানের শক্তি ; ভাবপ্রবণতার অভিযোগও আমি মানব। কিন্তু তবু বলব, আদর্শগত বিচারে দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ ছিল।

বিগত দু বছর ধরে লক্ষ্য করছিলাম, বিপ্লবী দল সংগঠনের ব্যাপারে লেনিনবাদী আদর্শ অনুসৃত হচ্ছিল না। এ নিয়ে আমার মনে বিক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছিল। লেনিনবাদ আমাদের এ শিক্ষাই দেয়, বিপ্লবী দল শ্রমজীবী জনসমষ্টির অগ্রচারী সৈনিক, ভ্যানগার্ড। অগ্রচারীর ভূমিকা যারা পালন করবে অর্থাৎ দলীয় সদস্য ও নেতৃবৃন্দ, তারা সর্বদাই মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের অধিকারে, চিন্তায়, আত্মত্যাগের অঙ্গীকারে, সংগ্রামের চেতনা ও সংকল্পে জনগণ থেকে দু-পা এগিয়ে থাকবে। লেনিন বলেছিলেন, বুদ্ধিমার্গীয় বিশ্লেষণের সাহায্যে বিপ্লবী তত্ত্বকে তারা এমনভাবে আত্মগত করবে যাতে যে কোন সামাজিক-রাষ্ট্রিক সমস্যাকে তারা সমাজতান্ত্রিক প্রেক্ষিত থেকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে, এবং জনসাধারণকেও সেভাবে প্রভাবিত উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু, লক্ষ্য করছিলাম, লেনিনবাদের প্রতি তত্ত্বগত আনুগত্য সত্ত্বেও সংগঠনকে সুদৃঢ় করা এবং দলীয় সদস্য পদের মানদণ্ড নির্ণয়ের ব্যাপারে ঐ মৌল আদর্শ অনুসৃত হচ্ছিল না। মানি, প্রাথমিক পর্বে উপযুক্ত কর্মীর অভাব ছিল। কিন্তু অচিরেই যাতে সেই অভাব দূর হয় এবং যথার্থ বিপ্লবী কর্মীর আবির্ভাব ঘটে, সেজন্য সেই মুহূর্তেই এর ভিত্তিভূমি কর্ষণ করা উচিত ছিল। এই মৌল লেনিনবাদী প্রত্যয় ও সর্ত পালন না করে যদি আদর্শের বালাইহীন দল কংগ্রেসের মত যে কোন মানুষকে সদস্যপদে বরণ করা হয় এবং, শুধু তাই নয়, নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়, তাহলে বিপ্লবী আদর্শের অঙ্গীকারে এবং বিপ্লবের অগ্রচারী সৈনিক রূপে দল কখনও বলিষ্ঠ হবে না। বিপ্লবের নামে আত্মপ্রবঞ্চনাই সার হবে।

আমাদের ইতিহাসসম্মত ভূমিকাও আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। যথাসময়ে কাল আমাদের নিক্ষেপ করবে রাস্তার ধারে, আবর্জনার স্তূপে।

পূর্বাপর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমি আলোচনা করছিলাম। আলোচ্য বৎসরে—১৯৪৮ সনে—এই সমস্যা সম্পর্কে আমি বিশেষ সোচ্চার হয়েছিলাম। নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল, বিশেষ ক'রে প্রতুল চৌধুরীর সঙ্গে। অনুভব করছিলাম, বেশ গুঞ্জরণের সৃষ্টি হয়েছিল। কিছুদিন বাদে দলীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে একদিন প্রতুলদা এসে আমাকে জানালেন, অরবিন্দবাবু, এবার আপনাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বানিয়ে দিচ্ছি। যেন আকাশ থেকে পড়লাম আমি: আমাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য?—প্রতুলদাকে আমার বিস্ময়বিমূঢ় প্রশ্ন।

নিমেষে সত্যদর্শন ঘটল আমার। মোহের আবরণ অপসৃত হলো। ক্রোধে অপমানে ঘৃণায় ফেটে পড়লাম আমি—ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষায়ই আমি লেনিনবাদী আদর্শের কথা বলে আসছিলাম প্রতুলদা? আপনারা কি করে আমাকে এত ছোট ভাবতে পারলেন? ক্ষোভে দুঃখে লাঞ্ছনায় উত্তেজনায় আমার শরীর তখন কাঁপছে, চোখে উষ্ণ জল। মনে হলো, জীবনে আর কখনও এমনভাবে অপমানিত হই নি। সেই দিনই দলীয় অফিস ত্যাগ করি। পুনরায় বলি, ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম; তাছাড়া আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চালানোর মত ক্ষমতা এবং বুদ্ধিমার্গীয় দক্ষতার অভাব ছিল আমার।

দলের প্রতি আনুগত্য, আদর্শ রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি এবং স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা কী ভয়ংকর এবং আত্মক্ষয়ী, তা উপলব্ধি করেছি আমি। দলীয় অফিস ত্যাগের পর দুদিন দুরাত্রি আমার চোখে ঘুম ছিল না। এক অভাবনীয় অনির্দেশ্য উত্তেজনায় শরীর অস্থিরতায় কেঁপে কেঁপে উঠত। আমার স্বপ্নকে কে যেন হত্যা করেছে। জেলখানার ভেতরে এবং বাইরে যাদের কাছ থেকে বৈপ্লবিক তত্ত্বের পাঠ গ্রহণ করে ছিলাম, তারা আমার সত্তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল; আর ভীড় জমালো

স্বপ্ন-উদ্দীপনায় প্রসন্ন মুহূর্তগুলো। সেই সামগ্রিক অভিযান থেকে বিচ্ছিন্নতায় অবতরণ ভীষণ, ভীষণ দুঃসহ মনে হতে লাগল। কাল তার স্নিগ্ধতার প্রলেপ এই যন্ত্রণার উপর বুলাতে লাগল নিঃশব্দে, আর দুঃখের মধ্যেও এক সময় আমার কৈশোরে মদের দোকানের সামনের অভিজ্ঞতা, গণিকাদের অট্টহাসি স্মৃতিপটে ভেসে উঠল। বৈপ্লবিক আদর্শও কি তাহলে একটা সুনিপুণ রাজনৈতিক ধাপ্পা, কেনাবেচার সামগ্রী? সেই সময় থেকে রাজনৈতিক দিক থেকে আমি নিঃসঙ্গ, একা।

স্বল্পকালের মধ্যে সংবাদপত্রের চাকুরি থেকেও বিদায় নিতে হলো। কি প্রসঙ্গ নিয়ে যেন সাংবাদিক-কর্মচারীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের গুরুতর বিরোধ দেখা দিয়েছিল। সেই বিরোধের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি না হওয়ায় সমবেতভাবে চাকুরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্ভবত শতকরা নব্বই জনই কাজে ইস্তফা দিয়েছিল। আমিও দিলাম। রাজনীতি এবং সাংবাদিকতা—উভয় ক্ষেত্র থেকেই স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিতে হওয়ায় আমি তখন সম্পূর্ণ দায়মুক্ত, নিরালম্ব বেকার। সুতরাং, একটি শিক্ষকতা অথবা অধ্যাপনার চাকুরি সংগ্রহ আত্যন্তিক হয়ে পড়ল।

সে সময়ে অথবা তার কিছু আগে ধানবাদ-ঝরিয়া অঞ্চলে কাটরাস-গড়ে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বর্তমানেও তার অস্তিত্ব আছে কি না জানি না। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করলাম, আর দলীয় এবং ব্যক্তিগত বন্ধু সত্যরঞ্জন বসুকে আমার মনোভাব ব্যক্ত করে একটি চিঠি লিখলাম। সে তখন হরগঙ্গা কলেজে (মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা) বাংলার অধ্যাপক। যথাসময়ে কাটরাসগড় থেকে ইণ্টারভিউ-এর চিঠি এলো। গেলাম, দিন দশেকের মধ্যে নিয়োগপত্র পেলাম, গ্রহণ করে চিঠিও গেল। নির্ধারিত দিনে যাত্রার জন্য প্রস্তুত, দুপুরের আগেই ছিল ট্রেন; রওনা হব হব করছি, এমন সময় মুন্সীগঞ্জ থেকে টেলিগ্রাম—সত্বর যোগদান করুন। কাটরাসগড়—মুন্সীগঞ্জ; মুন্সীগঞ্জ-কাটরাসগড়। আকস্মিক এই পট পরিবর্তনে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারায় পরামর্শের জন্য ছুটলাম

নীহারদার বাড়ি। আদ্যোপান্ত শুনে তিনি ড্রয়ার থেকে একটা টাকা বের করে এক দিকে 'এম' অন্য দিকে 'কে' লিখে (লাল পেন্সিলে) শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন। 'এম' বুকে নিয়ে টাকাটা স্থির হয়ে নিচে পড়ল। তিনি হেসে বললেন, যাও মুন্সীগঞ্জে। ইতিহাসের কী কৌতুক, সামাজিক আবর্তের কী বৈচিত্র্য, টস্-এ আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারিত হলো। যাচ্ছিলাম কাটরাসগড়, পৌঁছুলাম এসে মুন্সীগঞ্জ। সেই থেকে—১৯৪৯—আমার অধ্যাপক-জীবন আরম্ভ।

অথচ, আশ্চর্য, এই ঘটনা-পরম্পরা না ছিল আমার পরিকল্পনায় বা চিন্তায়, না ছিল অভিপ্রেত। এম-এ পাশ করব—এটা আমার প্রত্যক্ষ ভাবনার অন্তর্গত ছিল না। সুতরাং, অধ্যাপকের বিচ্ছিন্ন সীমা-নির্দিষ্ট অনুভবের ভুবন আমার কাম্য ছিল না। আর গবেষণা—সেটা তো উদ্দামতম কল্পনারও অতীত ছিল। এসব কিছুই চাই নি আমি। নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মাণের কর্মে আজীবন অঙ্গীকারবদ্ধ ও সংগ্রামরত থাকার সংকল্প ছিল আমার। জেনেছিলাম, রাস্তাই মানবিক অভিযানের একমাত্র রাস্তা। সেই রাস্তায় চলতে থাকব অবিরাম, চলতে চলতে লক্ষ মানুষের হাত ধরব, এবং স্থিরনিশ্চিত একদিন তুর্গেনিভের মেয়েটির মত দেহলী পার হব। মার্ক্সবাদী তত্ত্বের আশ্রয় লাভ করার পর থেকে এই জীবনাদর্শই আমি লালন করে আসছিলাম। এর মধ্যে ব্যক্তিক অভীপ্সা বা লাভ লোকসানের স্থান ছিল না।

কিন্তু, হলো না। যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে আমি বিচরণশীল ছিলাম, তার আভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের সংযোগ-বিয়োগ, ঐ সম্পর্কসঞ্জাত জটিলতা, জটিলতর ভাববিক্ষেপ, ইত্যাদি পরিণামে আমাকে রাস্তা থেকে নিক্ষেপ করল নিভৃত গৃহকোণে। প্রত্যয় ও অঙ্গীকারের শক্তি আজও নিঃসন্দেহে অম্লান, কিন্তু সেখানে অতি সহজে পথ চলা নেই, উদ্দীপনায় ঝাঁপিয়ে পড়া নেই, মানুষের হাত সুদূর। এখানে বিরাজিত এক বিক্ষুব্ধ স্তব্ধতা, কিন্তু ঐ স্তব্ধতা বিস্ফোরণ হয়ে সহসা রাস্তায় ফেটে পড়ে না। নতুন এক আবর্তের প্রতিবন্ধকতা অতি

বিপুল। এমনি করেই সম্ভবত কাল এক একজন মানুষকে অবাঞ্ছিত কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করে।

॥ ২ ॥

এভাবে আমার কক্ষ-পথ নির্ধারিত হয়ে যাওয়ায় তারই আবর্তনে বিচরণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। বিচরণের পথে পরিচিতি লাভ করলাম—দ্রুত, অপ্রত্যাশিত। 'বঙ্কিম মানস' শুধু যে একটা তক্‌মা এঁটে দিল নামের সঙ্গে তা নয়, দিল বিস্তৃতি। কিন্তু যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল, তাতে আমার ব্যক্তিগত উদ্যম, সংযোগ এবং প্রচেষ্টার চাইতে অন্য মানুষের উদ্দীপনা এবং উদ্যম ক্রিয়াশীল ছিল অধিক। বস্তুত, একটি মানুষের একক প্রচেষ্টা এক অপ্রতিরোধ্য উৎসাহের জোয়ারে আমার সংকোচ ও দ্বিধা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সে আমার বাল্য বন্ধু—অনিল দেব।

সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থায় শুধু উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস সম্বল করে কীভাবে যে ও একটি প্রকাশন সংস্থা—ইণ্ডিয়ানা—প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ভেবে আজও আমি বিস্ময়ে অভিভূত হই। সেই সংস্থার সম্ভাবনাময় সম্পদ রূপে ও আমাকে নির্বাচন করেছিল পরম সহৃদয়তায়, নির্ভরশীলতায় আর দুর্বার আশায়। কিন্তু আমি বোধ হয় ব্যর্থ হলাম, আমাকে কেন্দ্র করে ওর স্বপ্ন-পরিকল্পনা, নানা বিচিত্র ঘাত-সংঘাতে, সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। মনে পড়ে, এর আগে অন্য একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত না করতে পেরে তথাপি দুর্মর আশা নিয়ে ও একটা চিঠিতে আমাকে লিখেছিল, 'জীবনে বড়ো কিছু ঘটবে বলেই ছোট কিছু ঘটছে না'। ব্যবহারিক দিক থেকে বড়ো কিছু আজও ঘটে নি বলেই জানি। কিন্তু যথাসময়ে অঘটনটি অনিবার্যভাবেই ঘটল। প্রকাশন সংস্থাটিকে উজ্জীবিত রাখা গেল না। অনিলের অসামান্য উদ্যম ওর নিজের কোনই কাজে লাগল না, কিন্তু বুদ্ধিমার্গীয় ভুবনে আমাকে দিয়ে গেল বহুল পরিচয়ের ক্রমবর্ধমান এক

দিগন্ত। কাল-বিবর্তনের কি কৌতুক ও রহস্য, আবর্ত সৃষ্টি করল একজন, কিন্তু ভেসে উঠল আরেক জন।

গোড়ায় কাজের চাইতে অকাজ অর্থাৎ আড্ডাই হতো অধিক। সেই আড্ডার সূত্রে মনোজ বসু একদিন একটা মজার গল্প শুনিয়ে গেলেন। যতীন বাগচী মশাই-এর একটি বই-এর দোকান ছিল তদানীন্তন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। সেখানে প্রতিনিয়ত বসত সাহিত্যের আড্ডা—কবিতাপাঠ, গল্পপাঠ, আলোচনা, ইত্যাদি। যে ছেলেটি দোকান দেখাশুনা করত, ক্রমে সেও সাহিত্যের সমঝদার হয়ে উঠল। বই কেনা-বেচার মত শুষ্ক বাস্তবতার চাইতে কবি-সাহিত্যিকদের সরস কথাবার্তা শোনার জন্য তার কান ও মন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। একদিন আড্ডা জমজমাট, গল্পপাঠ চলছে ; উপস্থিত অন্যান্যদের মত ছেলেটিও গল্পের রসে মজে আছে। এমন সময় মূর্তিমান বেরসিকের মত হাজির হলো একজন খদ্দের, চাইল একটি বই। তৎক্ষণাৎ ছেলেটির মুখ থেকে জবাব বেরিয়ে এলো, নেই। নাছোড়বান্দা খদ্দের আবার বলল, আপনাদেরই তো বই, নেই মানে ? উত্তর—না, নেই। খদ্দেরটি তখন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ওই তো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। দিন আমাকে। ওদিকে গল্প তখন প্রায় পরিণতির দিকে, ছেলেটির এই উৎপাত সহ্য হচ্ছিল না ; দারুণ উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল, আপনাকে কত করে বলব যে এখানে বই বিক্রী হয় না, আপনি আসুন। খদ্দের বিদেয় নিল সত্যি, কিন্তু কিছু দিন বাদে দোকানটিও বিদায় নিল।

গল্পটির ইঙ্গিত অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। অনুরূপ কারণে না হলেও ইণ্ডিয়ানাকেও জীবন্ত রাখা যায় নি। তবে, যাবার আগে সে রেখে যায় কিছু সরস মুহূর্ত, কালযাত্রায় মূল্যবান মানুষের সংসর্গ, কিছু উজ্জ্বল স্বীকৃতি। রসের মুহূর্তগুলো অনেকের সাহচর্যে রচিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কবিশেখর কালিদাস রায়ও ছিলেন। একদিন—সম্ভবত ১৯৫৭-৫৮ সনের গ্রীষ্মকাল—কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে কবিশেখর বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু দু পা এগিয়েই ফিরলেন এবং ডাকলেন আমাকে। আমি

যেতে জিজ্ঞেস করলেন, অরবিন্দ, সিনেমা-টিনেমা দেখছ কিছু ইদানীং ?

—না, ও ব্যাপারে তেমন অনুরাগ নেই আমার। আপনি দেখেছেন ?

—হ্যাঁ, ছুটো দেখেছি (কি নাম বলেছিলেন স্মরণে নেই)। খুব ভালো লাগল গানগুলো ! কীর্তন, চমৎকার। তবে কি জানো, ওসব ছবি বেশিদিন চলবে না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি মুখখানা আমার কানের কাছে এনে চুপি চুপি বললেন, ওতে যে যুবতী মেয়ে নেই। তাকিয়ে দেখি, মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, চোখ এবং ঠোঁট দুষ্টুমিমাখা।

কয়েক মাস বাদে তেমনি একদিন কবিশেখর একদিন আমার মুখোমুখি বসে। তাঁকে দেখে ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী ঢুকলেন, এবং কবিশেখরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। ঐ জিনিসটা আমরা পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা সচরাচর করি না। ভালো লাগল। শাস্ত্রী মশায় আমার অপরিচিত ছিলেন না ; একাধিক বঙ্কিম-স্মরণ সভায় আমার সহ-বক্তা ছিলেন। কথায় কথায় তিনি কবিশেখরের 'হিমালয়' কবিতাটির উল্লেখ করলেন এবং বললেন, ছন্দের লালিত্য এবং ভাবগাম্ভীর্যে ঐ কবিতাটি অনবদ্য। বেশ কয়েকটি স্তবক আবৃত্তি করে শোনালেন। আবৃত্তি শ্রুতিমধুর হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কবিশেখর সুপ্রসন্ন। পুনরায় শাস্ত্রী মশায় মন্তব্য করলেন, আপনার এ শ্রেণীর কবিতা সত্যি অত্যন্ত ভালো।

কবিশেখর মুখ খুললেন, বললেন, কোথায় আর ভালো। এই তো অরবিন্দ বসে আছে, ও যদি বলে ভালো তবে ভালো ; নইলে কিসের ভালো।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। লক্ষ্য করলাম, তাঁর বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট হয়ে এলো, ছোট হতে হতে একসময় একদম বুজে গেল। অর্থাৎ, তিনি আমাকে চোখ টিপলেন। ঠোঁটে পরিচিত হাসি। রসে উজ্জীবিত এইসব বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত বিরস দৈনন্দিনতাকে অকস্মাৎ ঝলকিয়ে দিত, আর উন্মোচিত করত সুমধুর ব্যক্তিত্ব।

ইণ্ডিয়ানার প্রথম দিনগুলোতে যাঁরা কাছে এসেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন রামনাথ বিশ্বাস, ভূ-পর্যটক। প্রথম পরিচয়ের দিনটি আমার স্পষ্ট স্মরণে আছে। তখন 'বঙ্কিম মানস' ছাপা হচ্ছে, দু-তিনটে ফর্মা ছাপা হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত। বিকেলের দিকে তিনি এলেন, আমি বসে ছিলাম চুপচাপ, প্রথম ফর্মার ফাইল কপিটা তুলে নিয়ে চোখ বুলাতে লাগলেন, আমি ওঁর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলাম, তা ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল; দু-এক মিনিট বাদে বলে উঠলেন, বাব্বা, এতো দেখছি কঠিন দার্শনিক ব্যাপার, আমার সাধ্যে কুলাবে না।

অনিল পরিচয় করিয়ে দিল। শ্রীহট্টের লোক জেনে ওঁর আঞ্চলিক প্রেম উথলে উঠল। সেই থেকে ঘনিষ্ঠতা। বাড়িতেও মাঝে মধ্যে আসতেন। আমি দু-তিন বছর রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের একটি ছাপাখানা দেখাশুনা করি। ছাপাখানার উপরেই ছিল বসবাস। একদিন এলেন, দু-চার কথার পর জিজ্ঞেস করলেন, বৌমা কোথায়?

কি তাৎক্ষণিক দুষ্টুমি আমার মাথায় ভর করেছিল বলতে পারব না; বললাম, শি হ্যাজ লেফ্‌ট্ ক্যালকাটা।

—কোথায় গেছেন, বাপের বাড়ি?

—দ্যাট আই ডোণ্ট নো, আই ওনলি নো দ্যাট শি হ্যাজ লেফ্‌ট্ ক্যালকাটা।

—কার সঙ্গে গেলেন? সন্ত্রস্ত প্রশ্ন।

কালবিন্দুর কি এক রহস্যে অভিনয় তখন জমে গেছে। চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে তখন দারুণ উৎকণ্ঠা, হতাশা, বিক্ষোভ, গ্লানি ইত্যাদি সংযোগ করে বিরস কণ্ঠে বললাম, অফ্ কোর্স উইথ সামওয়ান, বাট উইথ হুম আই ডু নট নো।

ভয়ঙ্কর পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে গেছে, এই আশঙ্কায় তাঁর মুখ বিবর্ণ, কণ্ঠস্বর শুক্‌নো। দুই কনুই দিয়ে টেবিলে ভর রেখে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে আবার আমতা আমতা করে বললেন, কিছু বলে যান নি?

দেখলাম, মুখ শুকিয়ে একেবারে ফ্যাকাসে। আমিও মুখখানা যথাসম্ভব কালো করুণ নিরুপায় করে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বললাম, না।

কয়েক সেকেণ্ড কাটল। কাছেই আমার বাল্যসুহৃদ গুরুপদ (চক্রবর্তী) বসেছিল। আর সহ্য করতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল, আমি বুঝতে পারছি না কেন একজন নিরীহ ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্রী ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

বিশ্বাস মশায়ের মুখে রক্ত ফিরে এল; বুক থেকে যেন এক দুঃসহ পাথর নামল। ভারি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে আমার দিকে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে বললেন, ফাজিল, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে!

তাঁর সাইকেলে বিশ্বভ্রমণের কাহিনী এক সময় আমাদের দেহ মনে রোমাঞ্চ জাগাত। কিন্তু, সেই অভিজ্ঞতা বৃহত্তর মহত্তর কোন উপলব্ধিতে পরিণত হলো না বলে দুঃখ হয়। হলো না, কারণ বোধ-বুদ্ধি-মনন-সংবেদনার যে ব্যাপ্তি এই অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারত, তার অনুশীলন তাঁর জীবনে বিশেষ ছিল না। স্থূল বহিরঙ্গেই তাঁর দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। তবে, সহৃয়তার অভাব ছিল না। দৃষ্টিরও যে অভাব ছিল তাও ঠিক নয়, অভাবটা ছিল কর্ষণের। একদিন আমরা চার-পাঁচজন মিলে ওঁর ঘরে আড্ডা দিচ্ছিলাম। কথায় কথায় কে একজন ওঁকে জিজ্ঞেস করল, কালচার কি? ছিলেন বসা, উঠে দাঁড়িয়ে লুঙ্গির গিঁঠ খুলে দিগম্বর হবার উপক্রম করেছিলেন; বলেছিলেন, শালা, চারদিকে এত আবর্জনা, কদর্য কুৎসিত, সেদিকে চোখ যায় না, বলে কিনা কালচার কি!

একটি ভুঁই-ফোড় প্রতিষ্ঠানের গড়ে-ওঠা সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতুহল নিয়ে আসা-যাওয়া করতেন কৈলাসচন্দ্র আচার্য, যিনি এই শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি 'পতিতার আত্মকথা' এবং এ জাতীয় আরও দু-তিনটি পুস্তক সংকলন ও প্রকাশ করে এক অবিশ্বাস্য রকমের কলরব

সৃষ্টি করেছিলেন এবং জাগিয়েছিলেন বিস্তর সামাজিক ঔৎসুক্য। গলির মধ্যেই ছিল তাঁর পুস্তকাদির ব্যবসায়, উপরে—দোতলায়—বসবাস। তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ আমাদের নিকট মূল্যবান ছিল।

আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত ইণ্ডিয়ানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর তিনেক বাদে। হঠাৎ কিছু টাকার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। নিয়মিত যারা আড্ডা দিতে আসত সেই বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে না পারায় অপরিসীম লজ্জা ও সংকোচ কাটিয়ে আচার্য মশায়ের নিকটই প্রার্থী হলাম। সানন্দে দিলেন। একদিন বাদেই আমি টাকা ফিরিয়ে দিতে যাই। দিনটা খুব সম্ভব ছিল রবিবার, বিকেলে তিনি গলির মুখে মহেশ লাইব্রেরির নিকট দাঁড়িয়ে ছিলেন। কলেজ স্কোয়ারের দিক থেকে আমি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে ঢুকতেই আমাকে দেখে তিনি দ্রুত গলির ভেতরে একেবারে তাঁর বাড়ির সামনে সরে গেলেন, পাছে অধমর্ণ হিসেবে আমি লজ্জা পাই। খুশী হলাম, সম্ভ্রমও হলো। আমি যে তাঁর কাছেই যাচ্ছিলুম, সেটা অনুমান করতে পারেন নি। পকেট থেকে টাকা বের করতেই সবিস্ময়ে বললেন, এত তাড়াতাড়ি? আসুন, বসুন।

সেই যে বসা তা কালক্রমে প্রতিদিনের বসায় পরিণত হলো। প্রতিদিন কিছুটা সময় তাঁর সঙ্গে আমাকে কাটাতেই হতো। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ডেকে পাঠাতেন, ফোন করতেন, কোন কারণে যেতে বিলম্ব হলে পুনরায় ফোন বেজে উঠত, উৎকণ্ঠিত অনুনয় যেন তাঁর সঙ্গে দু-দণ্ড সময় কাটিয়ে আসি।

বয়সের বিপুল ব্যবধান কখন যে ঘুচে গিয়েছিল টের পাই নি। সমাজের কীট-পতঙ্গের ইতিহাস নিয়ে আচার্য মশায় ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন অনেক। ইন্দ্রিয়ের পীড়ন, লোভ লালসা, স্বার্থপরতা, ইত্যাদি কত বিচিত্র পথে যে আপন চরিতার্থতা খোঁজে তার অজস্র কাহিনী—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামধামসহ—তিনি আমাকে শুনিয়েছেন। আর সেই প্রবাহ-পথেই একদিন অতর্কিতে কিন্তু অনায়াস সজীবতায় নির্গত

হলে লাগল সেই সব অভিজ্ঞতার কথা, যা একান্ত ব্যক্তিগত এবং সংগোপন। আমার মনে হতো, ঐভাবে নিজেকে উন্মোচিত করতে পারায় তাঁর অন্তর যেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব মুক্তির আনন্দে স্ফূর্তি লাভ করছে।

রসাল সংলাপে এবং রসসৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রামনাথ বিশ্বাসের এক সম্পর্কিত নাতনির বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছিল। আচার্য মশায়কেও এ বিষয়ে বলে রাখা হয়েছিল। কিছুদিন বাদে ইণ্ডিয়ানার ঘর-ভর্তি সমাবেশে তিনি উপস্থিত হলেন। সম্ভবত বিশ্বাস মশায়ও তখন ছিলেন। আচার্য মশায় ঢুকতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন পাত্রের সন্ধান পেলেন? সঙ্গে সঙ্গে এক গাল হাসি হেসে উত্তর দিলেন, পাত্রের কথা যে বলেন, আমি তো নিজেরে ছাড়া আর কোন পাত্রই চোখে দেখি না।

প্রগলভ হাসিতে ঘর মুখর হলো। হাসি থামলে কথার পৃষ্ঠে কথা এসে যায়। বিয়ে, সামাজিক আচার বিচার, পণ, ইত্যাদি বিষয়ে। তিনি সম্বন্ধ নির্ণয়ে বংশপরিচয়, কুলশীল, ঐতিহ্য সংরক্ষণের পক্ষপাতী; অন্যরা সকলেই বিপক্ষে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখব, কুলশীল এসব আবার কি?

আচার্য মশায় বলেন, এসব প্রয়োজন, নইলে আপনাকে আমরা চিনব কি করে?

—আমাকে এমনি চেনা যায়, আমার গুণে, তার জন্যে আমার চোদ্দ পুরুষকে নিয়ে টানাটানি করার কোন প্রয়োজন নেই।

—আছে; নইলে সমাজ টিকে না, ধ্বংস হয়ে যায়।

—ধ্বংসের আর বাকি আছে কি? আপনারা জাতপাত করে করেই তো দেশটাকে উৎসন্নে দিলেন। ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেল।

—তা যাক। তাই বলে কাউকে ঘরে আনতে গেলে তার পেছনের ইতিহাস জানব না, এ হতেই পারে না।

বীরেনবাবু একটু তিক্ত কণ্ঠে বললেন, বেশ তো যাব পেছনে। কিন্তু,

আপনি যেখানে থামতে চাইছেন সেখানে আমি থামবো কেন? আমি আরও পেছনে যাব।

কিন্তু না ভেবেই আচার্য মশায় বললেন, যান।

অমনি বীরেনবাবু তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলে উঠলেন, সেখানে তো সবাই বনমানুষ।

প্রবল হাসিতে আড্ডা উচ্ছ্বসিত। আচার্য মশায়ের মুখেও পরাজিতের অপ্রসন্ন হাসি।

কোমল হৃদয়াবেগহীন, প্রখর বৈষয়িক ও ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন, শক্ত মানুষ হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। সেই মানুষই একদিন সম্পূর্ণ অন্য রূপে ধরা দিলেন আমার কাছে। কিছুক্ষণ গল্পসল্প করার পর এক সন্ধ্যায় উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

বললাম, কি, বলুন।

—আমার মৃত্যুর সময় আপনি আমার শিয়রের পাশে বসে থাকবেন।

দীর্ঘকাল পর আজ সেই কালবিন্দুর স্মৃতি স্মরণ করে মনে হচ্ছে, ঐ অনুরোধ যে জানায় সে তো ভালোবাসে। ভালোবাসায় মনুষ্যত্বের প্রকাশ এবং স্বীকৃতি। ভালোবাসার সেই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়-নি বলে দুঃখ হয়। সম্ভব হয় নি, কারণ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ছেড়ে বহু কাল আগেই আমি দক্ষিণ সিঁথি এলাকায় চলে এসেছিলাম। সেজন্য, অন্তিম মুহূর্তের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছায় নি।

আড্ডা থেকে উদ্‌ভূত রস ক্ষণবিন্দুগুলোকে আনন্দে বরণীয় করে তোলে। সে দিক থেকে রস নিঃসন্দেহে বরণীয়। কিন্তু রস থেকে মূল্যে, মূল্যবোধে উত্তরণ ও স্থিতিলাভ সাহিত্যের অঙ্গনে আমাদের অভীষ্ট।

সাহিত্যের বৃত্তে আমার আবর্তন সমালোচক রূপে। অবশ্য,

সমালোচনা শব্দটিকে কিছুটা ব্যাপ্তি দান করা যায় ; কারণ, ঐ সমালোচনায় সমাজ-সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা সংযুক্ত। তাই সবিনয়ে বলতে পারি, সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যের জিজ্ঞাসু ছাত্র রূপে আমি আবর্তিত হয়েছি এবং হচ্ছি। বলা বাহুল্য, মার্ক্সবাদে যে সামান্য দীক্ষা আমি লাভ করেছি, আর বিশ্বের যে অল্প কয়েজকন সংবেদনশীল স্রষ্টার সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে, তার অন্তর-সম্পদ ঐ আবর্তনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে। যদি সার্থকতা কিছু অর্জন করে থাকি তো তার কৃতিত্ব সবটাই মানস পটভূমির সতত ক্রিয়াশীল ঐ ভাবনা-চিন্তার ঐশ্বর্যের ; আর, ব্যর্থতা যেখানে, সেখানে রয়েছে আমার ব্যক্তিগত অক্ষমতার স্বাক্ষর।

ঐ বৃত্তে আবর্তনের পথে দেখেছি, কোন সৃষ্টিকে অথবা যে কোন সৃজনশীল কর্মকে যদি নির্দিষ্ট কাল-বিন্দুতে অস্তিত্বশীল মানবিক অভিজ্ঞতার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে জানা যায় তো সেই সৃষ্টি তার গভীরতর বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় আত্মপ্রকাশ করে। তার একক সীমার মধ্যে যে পরিচয় বিধৃত, গুণগতভাবে তার রূপান্তর ঘটে যখন অন্য সব মানবিক অভিব্যক্তি ও সংগঠনের মধ্যে তাকে উপলব্ধি করা যায়। সেই জানাই প্রকৃত জানা ; তা-ই মূল্যের বা শ্রেয়সের সন্ধান জানায়। এই দৃষ্টিকোণে স্বভাবতই কাল-বিন্দুতে অস্তিত্বশীল কথাটি অতিশয় গুরুত্ব অর্জন করে। অর্থাৎ, কাল-সচেতনতা বা কালের আন্তর প্রেরণা উপলব্ধি করা এই জিজ্ঞাসার প্রথম সোপান। আমার বিদ্যাবুদ্ধির সামান্য সঞ্চয় নিয়ে আমি কালবিন্দুতে স্থিত হওয়ার চেষ্টা করে এসেছি।

এ বিষয়ে এক সন্ধ্যায় সতীশদার (সরকার) সঙ্গে কিছু সময়ের আলোচনা আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কি কারণে ঠিক স্মরণে নেই যেন আমরা ঐ দিন ধর্মতলা থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত কোন যানবাহন ব্যবহার না করে হেঁটে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার মন ছিল কিছুটা উত্তপ্ত, বিক্ষুব্ধ। কারণ, সবে আমি সোভিয়েট সমালোচক অধ্যাপক এ.এ. স্মিরনভ রচিত 'শেক্সপীয়র' গ্রন্থখানা পাঠ করেছি।

তাতে শুদ্ধ গাণিতিক নিয়মে মার্ক্সবাদী সূত্রগুলোর প্রয়োগ দেখে আমি অতিশয় বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, অধ্যাপক স্মিরনভ যেন সাহিত্যিকের শ্রেণীগত আর্থিক স্বার্থবাদের বাইরে যেতে পারেন নি। তাই, শেক্সপীয়র সাহিতের গূঢ়তম ব্যঞ্জনা তাঁর উপলব্ধির অগোচর থেকে গেছে। সেই কথাই আমি সতীশদাকে বলতে বলতে আসছিলাম, এবং নাটকের পর নাটক ধরে ধরে ঐ বিশ্লেষণের অন্তঃসার-শূন্যতার প্রমাণ দিচ্ছিলাম।

সতীশদার ভূমিকা মুখ্যত ছিল শ্রোতার, প্রায় কিছুই বলছিলেন না। শেষটায় আমার কথা ফুরোলে তিনি বলে উঠলেন, বইখানা দেখছি খুবই ভালো হয়েছে।

বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে আমি প্রশ্ন করি, কিরকম ?

—স্মিরনভ যখন তোমাকে অতটা উত্তেজিত করিয়ে দিতে পেরেছেন, তখন মনে হচ্ছে বইখানা ভালোই হয়েছে।

ঠাট্টাটা বুঝতে পারলাম। দুজনেই হাসলাম। তারপর শুরু হলো সতীশদার কথা। যখন মেজাজে থাকতেন, তখন আশ্চর্য সুন্দর আলোচনা ফুটত তাঁর কথায়। সেদিনের সব কথার সারকথা যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল তা হলো, বুঝেছ অরবিন্দ, যখনই সমাজ-সংস্কৃতির বিচারে বসবে তখন মনে রাখবে, কাল-সচেতনতা উপলব্ধিকে দেয় গভীরতা আর স্থান-সচেতনতা দেয় ব্যাপ্তি। এর সার্থক সমন্বয় যখন ঘটে তখন আলোচনা ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়, মূল্যের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়।

কথাটা নিঃসন্দেহে অধীত বিদ্যারই ফসল। তবু, যে পটভূমিতে উচ্চারিত হয়েছিল, তাতে যে সংবেদনার দিক থেকে আমি খুবই আন্দোলিত হয়েছিলাম তাতে কোনই সন্দেহ সেই। কথাটা আজও, এই সুদীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও, আমাকে প্রেরণা যোগায় ; কাল ও স্থানের শাসনে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখার চেষ্টায় আমি সর্বদা সতর্ক থাকি। তারও বহু আগে, প্রথম যৌবনে, যে সব বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিকের রচনার

কালসজীবতার বৈশিষ্ট্য আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখত তাঁদের অন্যতম ছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ।

বার্নার্ড শ একদা লিখেছিলেন, 'আমার সাহিত্য এক যুগের নয় সর্ব-কালের, শাশ্বত'—এই অহমিকা নিয়ে যে লিখতে বসে তার পুরস্কার, সর্বযুগেই সে অপাঠ্য। আর যে মানুষ শুধু আপন সত্তা ও আপন কালকে রূপায়িত করে প্রকৃতপক্ষে সে-ই সমগ্র মানবগোষ্ঠী ও সমস্ত কালকে প্রতিফলিত করে। সর্বকালের বলে তাঁর কোন অহমিকা ছিল না ; কাল-সীমাবদ্ধতাকে যদি সাংবাদিকতা বলা হয়, তবে তাই শিরোধার্য।

যৌবনে এই মনোভঙ্গির সততায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। সত্য যে, শিল্প-বিচারে তাঁর নাটকে নানাবিধ অসম্পূর্ণতা আবিষ্কার করা কঠিন নয়। কিন্তু, উদ্‌ধৃত উক্তিটির পশ্চাতে এমন একটি মন ক্রিয়াশীল ছিল যা সজীব, আত্মসচেতন, কালসচেতন, মানবিক সমস্যায় উদ্বিগ্ন। এরূপ মনকে সময়ের পরিমাপে বলা যায়, দ্বি-মাত্রিক—বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে প্রসারিত। বর্তমানকে নিয়ে তার ব্যস্ততা ভবিষ্যতে উত্তরণের জন্য। বলা বাহুল্য, শ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার হয়ে ওকালতি করেন নি কখনও, বরং একে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছেন, যদিও তিনি মার্ক্সবাদীও ছিলেন না। কোন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর যেমন সমগ্রভাবে ব্যর্থ হয় না, তেমনি মানব-ভবিষ্যতের রূপকার হিসেবে তাঁর অবদানও অবশ্য স্বীকার্য।

তবে, তাঁর মতের বিরুদ্ধচারীরাও সংখ্যায় কম নয় ; সংখ্যায় বরং তারাই বেশি, আজও—অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরেও—বেশি। তাদের দৃষ্টিতে সাহিত্য সমাজ ও কাল নিরপেক্ষ, আপন বিকাশেই তার সার্থকতা। পাশ্চাত্যে যেমন আমাদের দেশেও তেমনি, তারা শিল্প-সাহিত্যের ভুবন ও শিক্ষার জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিরাজ করছে। সমস্যাটিকে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে আলোচনা করা যাক। আমার গবেষণা-গ্রন্থ 'বঙ্কিম মানস'-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হওয়ার পর তৎকালীন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তা

উপস্থাপনার উপযুক্ত হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন। দিয়েছিলাম। তিনি স্বয়ং তা পাঠ না করে তাঁর এক অতি সুখ্যাত ছাত্র-অধ্যাপককে বিচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ লিখিত মতামতে আমার বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে মৌল আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সাহিত্য সমাজ, সমাজ-সম্পর্ক, ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়—কম্যুনিস্টদের এই অভিমত "সর্বজনগ্রাহ্য নহে"। সেটা ১৯৪৯ সনের কথা। সেই অধ্যাপকই ১৯৭৭ সনে (৫ই ডিসেম্বর) একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন, "চলমান চিন্তাধারা ও পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ কেমন করিয়া শরৎ-সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে আপনি তাহার সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন এবং এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্রের শিল্পী সত্তার বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হইয়াছে। অবশ্য ইহাও বলিব যে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে আমার মৌলিক সহানুভূতি নাই। স্রষ্টার সৃষ্টির প্রধান গুণ সজীব মানুষ সৃষ্টি করা যাহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। Aristotle এই কথাটাই বলিয়াছেন অন্যভাবে। (বাইওয়াটারের অনুবাদ অনুসারে) singulars universal হইয়া উঠে। আপনাদের সমালোচনায় universal singular-কে আচ্ছন্ন করিতে চায়। অবশ্য আমার এই মন্তব্যও একদেশদর্শী।" (প্রসঙ্গ ছিল, আমার 'শরৎচন্দ্র—শ্রেয়সের সন্ধানে' পুস্তিকাটি পাঠান্তে তাঁর প্রতিক্রিয়া।)

প্রায় ত্রিশ বছরের ব্যবধানেও দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। সাহিত্যকে এই প্রেক্ষিত থেকে গ্রহণ ও বিচার করার মনোভঙ্গি আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে খুবই প্রচলিত। বিশেষ ও নির্বিশেষের প্রত্যয়কে দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে তাদের তত্ত্বগত সম্পর্ক নির্ণয় করা যেতে পারে এবং তাতে কেউ স্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, এই বিশেষ কি দেশ ও কালের অতীত? যদি উত্তরে বলা হয়, না, তাহলে মানতেই হয় সেক্ষেত্রে তার অনুভব

উপলব্ধি-চৈতন্যের জগৎ দেশ ও কালের অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর যদি বলা হয় ঐ বিশেষ দেশকালাতীত, তাহলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে তা বিশেষ নয়, বিশেষের নির্যাস। কারণ, ব্যক্তি-বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকৃত, কিন্তু ব্যক্তির নির্যাস, সে সর্বকালীন অস্তিত্বের দাবিদার বলেই,—কখনও অস্তিত্বশীল হয় না, হতে পারে না। সেই নির্যাস অনায়াসে যুগ থেকে যুগান্তরে যাতায়াত করে, কালের চলার চিহ্ন তার গায়ে আঁচড় কাটে না। সে অব্যয়, অক্ষয়—অন্য কথায়, মৃত। যেমন মৃত আরিস্টটলের পূর্বকথিত রক্তহীন তত্ত্ব, যা আড়াই হাজার বছর পার হয়ে এসেছে কিন্তু এর বিশুষ্ক জীর্ণতা দিয়ে বর্তমান কালের ব্যক্তি-বিশেষকে না যাবে জানা, না যাবে উপলব্ধি করা।

অথচ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে, সমাজ ও সময়-নিরপেক্ষ ব্যক্তির স্বাধীনতার নামে কি যাচ্ছেতাই কাণ্ড করা সম্ভব, সম্প্রতি কালের কিছু বাংলা উপন্যাস তার প্রমাণ রেখেছে। বর্তমান কালে ও সমাজব্যবস্থায় সাহিত্য-সংস্কৃতি এক বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত। এখানে বৃহৎ-ব্যবসায়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে দীর্ঘকাল, এবং ব্যবসায়িক তুলাদণ্ডেই এর গতি ও চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে। সাহিত্য বিপণনের মাধ্যমে, অল্প সময়ে, যাতে আধুনিক কালের স্টেটাস সিম্বল বা আভিজাত্যের স্তম্ভগুলো আয়ত্ত তথা উপভোগ করা যায়, সে দিকে দৃষ্টি রেখে কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক মানবব্যক্তিত্বের এক হ্রস্ব, বিকৃত চিত্র পরিবেষণ করছে। তাদের উপলব্ধিতে মানুষ এক ইন্দ্রিয়-তাড়িত জীবমাত্র, সমস্ত প্রকার জাগতিক লালসা চরিতার্থ করাই যার অভিষ্ট। ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, সামাজিক শ্রেয়স, ইত্যাদি ভাবনায় উদ্বিগ্ন না হয়ে যে কোন প্রকার আসক্তিতে অবগাহন করাই তার পরম তৃপ্তি ও নির্বাধ স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও অভিব্যক্তি।

কিন্তু, এই কি মানবিক স্বাধীনতার আদর্শ? বাস্তবিক পক্ষে, মানব-ব্যক্তিত্বের প্রকৃতই মূল্যবান যে সম্পদ এই মনোভঙ্গি তা থেকে বিচ্যুত। সে সম্পদ হলো সৃষ্টিশীল শ্রমের অংশীদার হওয়া, দায়িত্বের

বোধ ও অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা। কিন্তু, বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত সাহিত্য স্বেচ্ছায় সেই সম্পদের অধিকার হারিয়েছে—শুধুই খেয়ালখুশী মাফিক নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে শ তাঁর একটি নাটকের মুখবন্ধে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন, এর নামই কি স্বাধীনতা? সত্যি বলতে কি এ তো আত্মক্ষয়, মানবগোষ্ঠীর আত্মবিনাশের, ব্যক্তির মৃত্যু-বরণের স্বাধীনতা। রুচি ও আদর্শের বিকৃতি না ঘটলে এবংবিধ স্বাধীনতা কোন মানুষই কামনা করতে পারে না।

এই বাণিজ্যিক সাহিত্য ও তার রচয়িতাদের আমি ঘৃণা করি। ঘৃণা করি কোন ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ঘৃণা করি এ মানবিক ঐশ্বর্যের বদলে বিকৃতির সন্ধানে লিপ্ত বলে, দায়িত্বের বোধহীন বলে, পশ্চিমের আবর্জনাকে সহজে আত্মস্থ করে বলে, আর ঘৃণা করি বৃহৎ-ব্যবসায়ের পণ্য রূপে আত্মবিক্রয় করে বলে। অথচ, মানবিক ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করার জন্য কোন রাজনৈতিক শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করার আদৌ প্রয়োজন হয় না; সমাজতন্ত্রী অথবা কম্যুনিস্ট হওয়ার সর্ত থাকে না। ঐতিহ্যে স্থিত থেকেও মানবিক ঐশ্বর্যের রূপায়ণ সম্ভবপর, সুনিপুণভাবেই তা করা যেতে পারে। সম্প্রতি একটি চমৎকার উক্তি নজরে পড়ল। পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে যে কৃত্রিম প্রাচীর, তার গায়ে কে যেন এ-কথাটি উৎকীর্ণ করে রেখেছে—Live alone and free, like a tree, but in the brotherhood of the forest (বৃক্ষের মতো বেঁচে থেকো, একাকী এবং স্বাধীন, কিন্তু অরণ্যের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে)। মানব-অরণ্যের ভ্রাতৃত্বে, সহমর্মিতায় ও সমব্যথিত্বে, যদি কোন সাহিত্যিক আপন অস্তিত্বের সত্যতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়, তাহলে, কোন রাজনৈতিক মার্কা না থাকলেও তার সৃষ্টি কালের ছন্দে স্পন্দিত হবে, দ্বি-মাত্রা অর্জন করবে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে প্রসারিত হবে।

সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কি, প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ,

আলোচনা করা যায় এবার। এ কথা সুবিদিত যে মার্কস সাহিত্যপাঠে অসাধারণ উৎসাহী ছিলেন। কারণ, সাহিত্যের পৃষ্ঠায়ই সামাজিক সম্পর্ক ও মানব সম্পর্কের চিত্র—কখনও আশায় উদ্বেল, কখনও করুণায় আর্দ্র, কখনও ভয়াবহতায় পৈশাচিক—তার সমগ্রতায় প্রতিফলিত হয়। সেই চিত্র পাঠকের সংবেদনায় সত্য হয়, তার অনুভূতিকে করে প্রখর এবং পরিণামে কর্মের উদ্দীপনায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং, বৈপ্লবিক রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি।

বিতর্ক শুধু প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নির্ণয় নিয়ে। লেনিনের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের আত্যন্তিক গরজে সাহিত্যকে ব্যবহার করার প্রবণতা নিশ্চয়ই প্রবল ছিল। কিন্তু তিনি যে যথেষ্ট পরিমাণ সুবিবেচক ছিলেন তার বহু প্রমাণও বিদ্যমান। শিল্প-জিজ্ঞাসায় লেনিন-সূত্র হলো এ প্রকার—আলোচ্য শিল্পকর্মে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কাল, সমাজ-শক্তিগুলোর ঘাত-সংঘাত, শ্রেণীসংগ্রাম, রাজনৈতিক অনুভব, জনগণের আশা-আশঙ্কা ইত্যাদি যথাযথ এবং মনোহর রূপ ধারণ করে অভিব্যক্তি লাভ করেছে কিনা ; করে থাকলে ঐ রূপসৃষ্টি সার্থক। শিল্প-সাহিত্যকে তিনি গণ-শিক্ষার একটি মাধ্যম ছাড়াও দ্বন্দ্বমুখর বাস্তব সত্যকে জানা ও তার আন্তর-সম্পর্ক উন্মোচনের উপায় হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁর উদার মনের স্বাক্ষর পাওয়া যায় গোর্কির নিকট লেখা একটি চিঠিতে। তাতে তিনি বলেন, শিল্পী শিল্পের পক্ষে মূল্যবান উপাদান যে কোন দর্শনশাস্ত্র থেকে আহরণ করতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং এমন কি আদর্শবাদী দর্শনশাস্ত্র থেকেও উপাদান সংগ্রহ করে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির পক্ষে খুবই কার্যকর হবে। এই উক্তির মধ্যে এমন একটি ভাবুক চিত্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যা গোঁড়ামি দ্বারা সীমাবদ্ধ, সঙ্কুচিত নয়।

রাজনীতি ও শিল্পসাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে মাও যা বলেছেন তা, আমার বিশ্বাস, বিতর্কমূলক, যদিচ লেনিন প্রদর্শিত যুক্তি সোপানের উপরই তাঁর অধিষ্ঠান। তাঁর মতে, শিল্প ও সাহিত্য

সমালোচনার মানদণ্ড দুটি, একটি রাজনৈতিক, অপরটি শিল্পগত। এ দুয়ের সম্পর্ক নির্ধারণে রাজনৈতিক বিচারকে উর্ধ্বে স্থাপন করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, শিল্প ও সাহিত্য রাজনীতির নিয়ন্ত্রণাধীন, অবশ্য, পক্ষান্তরে, রাজনীতির উপর এদের প্রভাবও বিস্তর।

এখন প্রশ্ন হলো, রূপসৃষ্টির সুষমা বজায় রেখেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভবপর, আবার প্রচার অথবা শুধু চিৎকার করেও তা করা যেতে পারে। উপরন্তু, রাজনৈতিক ফসল ফলানো যদি মুখ্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সৌন্দর্য থেকে প্রচারটাই অধিকতর উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে। এই তত্ত্বকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে সাহিত্যের ভুবন আপনা থেকেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে; সাহিত্যের সম্পদ বৃহত্তর জনসমষ্টির আনুভূতিক সত্যতায় প্রতিষ্ঠিত হবে না। [অবশ্য চীনে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল তা সঠিক আমার জানা নেই।] তাছাড়া, রূপসৃষ্টির আকৃতি কখনও প্রশাসনিক নির্দেশনামার অপেক্ষায় থাকে কিনা, অথবা আন্তরিক অনুপ্রেরণা ব্যতীত মহৎ রূপসৃষ্টি আদৌ সম্ভব কিনা, সৃজনধর্মী মানস তা বিচার করবে। আমার বিশ্বাস, সংবেদনায়-অনুভবে উদ্দীপ্ত না হলে রূপসৃষ্টি অসম্ভব। সেজন্য, মাও-এর যুক্তিশৃঙ্খলা ও সিদ্ধান্ত অতিশয় বিতর্কমূলক।

তবে, একথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না যে অবিনশ্বর আবেদন সহ যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক শিল্পসাহিত্য রচিত হয়ে আসছে, এবং হবেও। কেন না, এর সঙ্গে মানব-সত্তার বিবেক ও সংগ্রামশীলতার প্রশ্ন জড়িত। যে মানুষ বিবেকবান এবং মানবিক কল্যাণের চেতনায় উদ্দীপ্ত, তার নিকট সত্য, ন্যায়, স্বাধীনতা, শ্রেয়স, ইত্যাদি প্রত্যয় আত্যন্তিক। সেই মানুষ যদি শিল্প-সাহিত্যকে তার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করে, তাহলে ঐ প্রত্যয়গুলোর স্বীকৃতিতে তার মাধ্যম সোচ্চার হবেই হবে। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্ম থেকে দূরাবস্থিত থেকেও এই বিবেকবান মানুষেরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটে নিশ্চিতভাবে সাড়া দেয়, এবং তাদের এই সাড়া—

কাব্যে হোক, গল্পে হোক, রূপকর্মে হোক—রাজনৈতিক ব্যঞ্জনায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এ ভাবে সাড়া না দিয়ে তাদের বোধ হয় গত্যন্তর থাকে না। দু-একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাক। ১৯৫৭ সনে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের খাদ্যমন্ত্রিত্বের কালে খাদ্য-আন্দোলনে কয়েকজন মহিলা সহ বেশ কিছু লোক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। তখন অন্নদাশঙ্কর রায় একটি ছড়া লিখেছিলেন, যার শেষ দু'টি লাইন ছিল এই প্রকার :—

ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারার গোঁসাই
তুর্কি না তাতার না গৌড়ীয় মশাই।

এখানে ব্যঙ্গ পরিহাস রাজনৈতিক তাৎপর্যে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক মতবাদে দীক্ষিত হয়ে বা না হয়েও বিবেকবান কবি এমন কি ভালবাসার কবিতাকেও রাজনৈতিক উদ্দীপনায় মণ্ডিত করতে পারে। যেমন—

ভালোবেসে চাঁদ হয়ো নাকো
পার যদি সূর্য হয়ে এসো
আমি সে উত্তাপ নিয়ে নিয়ে
আঁধার অরণ্য জ্বেলে দেবো।......ইত্যাদি

[মুরারি মুখোপাধ্যায়, সত্তর দশকে পুলিশের গুলিতে নিহত]

বিবেকবান মানুষকে তার সৃষ্টির, উপলব্ধির, আত্মপ্রকাশের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতায় স্থিত থাকতে দেওয়াই সঙ্গত। আপন সত্তার গরজেই সে সোচ্চার হবে, অন্য মানুষকে উদ্দীপ্ত করবে, কোন নির্দেশনামার অপেক্ষায় বসে থাকবে না। এই বিবেকবান মানুষদের আর্তি গ্যেটের একটি সুন্দর উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে—যদি দুঃখে আঘাতে মানুষ বাক্‌শক্তি হারায় তবে কী যন্ত্রণায় আমার হৃদয় কাঁদে তা ব্যক্ত করার ভাষা ঈশ্বর আমাকে দিন।

কিন্তু বিপত্তি ঘটে তখনই যখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অথবা রাষ্ট্রপ্রশাসকগণ ব্যক্তিক বিবেক ও মননের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে উদ্যত হন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এক স্তরে গান্ধীজী দ্রুত স্বরাজ আনয়নের জন্য তাঁর চরকার উপযোগিতার প্রতি নিরঙ্কুশ আস্থা দাবি

করেছিলেন, এবং প্রকারান্তরে আমাদের স্বাধীনচিত্ততার উপর আঘাত হেনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। স্তালিনের আমলে সোভিয়েতে মানুষের কণ্ঠহরণের বিপুল আয়োজন হয়েছিল। জনৈক রুশ কবির একটি কবিতায় পড়েছিলাম, স্তালিনের জীবদ্দশায় সবই ছিল সহজ। কারণ, মানুষ জানত দুনিয়ার তাবৎ 'কে' 'কি' এবং 'কেন'-র উত্তর যথাসময়ে পাওয়া যাবে। এই মনোভঙ্গির মধ্যে এক ধরনের ক্লীবত্ব নিহিত, যা ছিল রাষ্ট্রনায়কদের কাম্য। এ ব্যবস্থা কিছুদিন চলে, চিরকাল চলে না, চলেও নি। মাও পূর্ব-আলোচিত তত্ত্বের সহায়তায় শিল্পসাহিত্যকে সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলায় বাঁধতে চেয়েছিলেন। সে প্রচেষ্টাও সফল হয় নি।

আসলে একটা সময় আসে যখন মানুষ স্বয়ং গোঁড়ামির শিকারে পরিণত হয়, পরাজয় বরণ করে। এটা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে যেমন, রাষ্ট্র কাঠামোর পক্ষেও তেমনি সত্য। কে জানে কালের আবর্ত এমনি-ভাবে প্রতিশোধ নেয় কিনা। দুটো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করি। এ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষ দিক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের দু-এক বছর আগে, তখনকার একজন তরুণ অতিশয় উগ্র ও উৎসাহী মার্কসবাদী মেঘদূতের অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণের দুর্দান্ত সাহস দেখিয়ে-ছিলেন। বয়স তখন অল্প, তাঁর বক্তব্য বিশেষ বুঝেছিলাম কিনা মনে নেই; তবে এটা লক্ষ্য করেছিলাম, আলোচনায় অংশগ্রহণকারী— অন্যান্য বক্তার নিকট তাঁকে প্রচুর বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। সেদিনের উৎকট বুদ্ধিজীবী পরবর্তী কালে অধ্যাপনা করেছেন, দু-একখানা গ্রন্থও রচনা করেছেন। সর্বশেষ সংবাদ—মার্ক্সবাদী জীবনদর্শন থেকে তিনি বহুদিন পূর্বে বিদায় নিয়েছেন, গলায় এখন তুলসীর মালা, দু-তিন দিন বৈষ্ণবীয় ফোঁটাতিলক করতেও দেখলাম, জপ-তপ তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি এখন তাঁর আশ্রয়। অপর দৃষ্টান্তটি আরও ঘনিষ্ঠ। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকের কোন একটি সিনেমায় ব্যবহৃত একটি গানের একটি কলি ছিল এই প্রকার—'জানি না কোথায়

আছি, রাশিয়া কিংবা রঁাচি'। এই লাইনটির প্রখর পরিহাস আমি খুব উপভোগ করতাম, এবং ময়মনসিংহ জেলে অবস্থানকালে এটা প্রায়ই আওড়াতাম। শুনে আমাদের এক দলীয় বন্ধু ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন এবং আমাকে ধমকাতেন, তোমার মুখে এ জিনিস শোভা পায়? বুঝতাম, পরিহাস উপভোগ করার মত মানসিক গুণের অধিকারী তিনি নন। আমি কিন্তু সংশোধিত হলাম না। দিন গেল; জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করলেন; ঘর সংসার, ধর্মকর্ম ইত্যাদি স্তর পার হয়ে তিনি বর্তমানে অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন বলে শুনেছি।

এবংবিধ দৃষ্টান্ত বোধহয় আরও অনেক পাওয়া যাবে। এই ভদ্রলোকদের পরিণতির কথা আমি অনেক সময় ভাবি। মনে হয়, মানবিক অভিজ্ঞতার মার্ক্স-এঙ্গেলসকথিত সার্বিক বা বহুধা-বিস্তৃত বৈশিষ্ট্যের কথা বিস্মৃত হয়ে যদি মাত্র দু-তিনটি গাণিতিক সূত্রের মধ্যে উপলব্ধিকে সীমিত রাখা হয়, তাহলে মনের বিচরণক্ষেত্র আপনা থেকেই সঙ্কুচিত হয়ে আসে। প্রাথমিক উগ্রতার আবেশে সেই ক্ষুদ্র জগৎ নিয়ে কিছুদিন তৃপ্ত থাকা যায়, কিছু দাপাদাপিও করা চলে। কিন্তু, তারপরেই শুরু হয় প্রতিক্রিয়া, যার টানে তখন অবক্ষয়ী মূল্যবোধের নিকট অথবা রক্ষণশীলতার কোলে আশ্রয় গ্রহণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। যেমন, ঐ দুই ভদ্রলোকের হয়েছে; যেমন এককালের কম্যুনিস্ট বলে চিহ্নিত কবি-সাহিত্যিকদের বর্তমানে বৃহৎ-ব্যবসায়ের আশ্রয়ে বাণিজ্যিক সাহিত্য রচনায় নিবিষ্ট দেখা যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা হলো উপলব্ধির অসম্পূর্ণতা। মার্ক্সবাদ তো সমাজবদলের নিছক একটা অস্ত্র নয়, এ হলো এক সুউন্নত জীবনদর্শন। এই দর্শন সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ইত্যাদি প্রত্যয়ের উপর যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনি তা মানব-অরণ্যের ভ্রাতৃত্বে ও একাত্মতায় মানুষের সার্বিক মুক্তির স্বপ্ন-আশা-অবশ্যম্ভাবিতার উপলব্ধিতে উদ্দীপ্ত। সেই সুব্যাপ্ত বোধে উজ্জীবিত হতে হলে মানব-অভিব্যক্তির সমস্ত দিকে মার্কসবাদীর অনুভব-বোধ-উপলব্ধি কর্মকে ছড়িয়ে দিতে হয়,

ছড়িয়ে রাখতে হয়। তার সর্বাঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, লাগাতে হয় আকাশ; তবেই তো চিত্ত ও ব্যক্তিত্ব ঐশ্বর্যশীল হবে। না পারলেই সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা ও পরিণামে পরাজয় বরণ। পরাজিত শিল্পী সাহিত্যিকেরা অর্থের মহীরুহ খোঁজে, পায়ও। তাদের রূপকর্মকে সেই জন্যই আমি ঘৃণা করি, বলি চরিত্রহীন। আর পরাজয় তো সমস্ত বিচারেই অশ্রদ্ধেয়, অপৌরুষেয়।

এই চরিত্রহীনতা রাজনীতির প্রাঙ্গণেও অনুপ্রবেশ করতে পারে, করেছেও। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব এমন মানুষদের হাতে, যারা সত্য, ন্যায়বিচার, মানব কল্যাণ ইত্যাদি প্রত্যয়গুলোর সঙ্গে অপরিচিত। কংগ্রেসের শেষ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস সংগ্রাম ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের আদর্শ থেকে ক্রম-বিচ্যুতির ইতিহাস, যা বর্তমানে বেশরম আদর্শহীনতায় পরিণত। যৌবনে হ্যারল্ড লাস্কির একটি গ্রন্থে তৎকালীন রক্ষণশীল সরকারের সমালোচনা পাঠ করেছিলাম। তিনি একে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার ও দুষ্কৃতির সমবায় (কম্বিনেশন অব প্রিভিলেজ অ্যাণ্ড গ্যাংস্টারিজম) বলে অভিহিত করেছিলেন। হুবহু এই মন্তব্যের সহায়তায় ভারতের কেন্দ্রীয় এবং অধিকাংশ রাজ্য সরকার-গুলোর চরিত্র বিশ্লেষণ করা চলে। এই রাজনীতি যে চরিত্রহীন তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

দুঃখের বিষয়, বামপন্থী নেতৃত্বও আজ এই চরিত্রহীনতার শিকার। কারণ, তত্ত্বগত আদর্শ এবং যুক্তি-পরম্পরা যে অনিবার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি জানায় তা গ্রহণে অনিচ্ছুক নেতৃত্ব যে চরিত্রহীন তা বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। আর, যথার্থ প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে বিচার করলে দেখা যাবে, এই চরিত্র-সংকট নতুন কিছু নয়; এই ব্যাধি দীর্ঘ কালের পুরাতন। এই নেতৃত্ব কি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা অথবা আহ্বান জানাতে পারে? প্রসঙ্গত, একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, ঘটনাটি কবি-বন্ধু চিত্ত ঘোষের নিকট শোনা। এক কালের একজন বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট নেতা কয়েকজন কবির নিকট এই প্রশ্নটি রেখেছিলেন,

'আপনারা ম্যাক্সিম গোর্কির মত লিখতে পারেন না কেন?' উপস্থিত কবিদের মধ্যে একজন স্পষ্টবাদী কবি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন. 'গোর্কির সময় বলশেভিক পার্টির নেতা ছিলেন লেনিন, আর আমাদের নেতা হলেন আপনি। কাজেই বুঝতে পারছেন', ইত্যাদি। অতিশয় বাস্তব সত্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য সত্য। কালের উন্মোচনের পথে বামমার্গীয় নেতৃবৃন্দের যে পরিচয় উদ্‌ঘাটিত, তাতে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণার বীজ অনুপস্থিত। আজ মহৎ আত্মত্যাগে তাঁরা যেমন অক্ষম, তেমনি নিঃশেষিত তাদের জনসমষ্টিকে উদ্বুদ্ধ করার শক্তি। কারণ, তাঁরা স্বর্ণ স্পর্শ করেছেন, আর স্বর্ণ স্পর্শ করেছে তাঁদের হৃদয়। সুতরাং আদর্শের কথা, বিপ্লবের কথা পুঁথিতে থাক, সম্মেলনে থাক, থাক 'গড়ের মাঠে গাছের জন্যে / অগ্নিভাষণ নেতার' (শক্তিব্রত ঘোষ)। ইতিমধ্যে প্রাত্যহিক জীবন হোক স্বর্ণাচ্ছাদিত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বার ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের অমানবায়িত পৃথিবী সম্পর্কে ইণ্ডিয়ানার এক সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠেছিল ; আলোচনায়, আক্রমণে, প্রতিবাদের প্রখরতায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, তাঁর 'সূর্যমুখী' গ্রন্থটি এই সংস্থা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ; সম্ভবত সেটি ছিল পুস্তকাকারে প্রকাশিত ওঁর প্রথম উপন্যাস। সেই সূত্রে সে সময় প্রায়শ যাতায়াত করতেন, উপস্থিত সংলাপে ওঁর দক্ষতা উপভোগ্য ছিল। সাহিত্য অথবা উপন্যাসের শিল্প-শৈলী বিষয়ে কথা উঠলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিকদের শিল্পকলা সম্পর্কে বিদগ্ধ মন্তব্য করতেন। একজন সম্পর্কে বলতেন, ওঁর উপমা কি রকম জানেন ? কলের জল সরু হতে হতে আলেকজান্দার সূতোর মত হয়ে গেল ! অন্য আর একজন সম্পর্কে ওঁর মন্তব্য ছিল, ওঁর তো সেই থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়। দূর প্রবাসে কোথায়ও দুজনের অপ্রস্তুত দেখা, ধীরে ধীরে স্মৃতি উন্মোচন, অনুরাগ, বিদায়। আপনি দিয়ে আরম্ভ, আর তুমি সম্বোধনে সমাপ্তি। একই ফরমূলা, শুধু প্রয়োগ পরিবেশ স্বতন্ত্র।

অন্য একটি সংস্থা থেকে 'বার ঘর' প্রকাশিত হবার পর একখানা বই তিনি আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। কয়েক দিন পর এক সন্ধ্যায় এলেন। তখন ইণ্ডিয়ানায় ফুল হাউস, হালকা সংলাপে প্রসন্ন দীপ্তি। ঢুকতেই আমি কণ্ঠস্বরে কপট গাম্ভীর্য সঞ্চার করে বললাম, আপনার বইখানা ফিরিয়ে নিয়ে যান জোতিরিন্দ্রবাবু।

শুনে কেমন যেন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার মনে হলো, খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে যেন বললেন, সে কি কথা! আমি উপহার দিয়েছি আপনাদের, ফিরিয়ে নেব মানে?

আমার গাম্ভীর্য গম্ভীরতর হলো। বললাম, আপনিই তো বলেছেন, আপনার বই খদ্দেররা ফিরিয়ে দিতে আসে, প্রকাশকের সঙ্গে বচসা হয়, টাকা ফেরৎ চায়। আমি বই কিনি নি, তবু ফেরৎ দিতে চাইছি বইটা।

প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, কিছুদিন আগে ওঁর 'ট্যাক্সিওয়ালা' নামে একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। জনৈক পাঠক একখানা বই কিনে পরদিন ফেরৎ দিতে এসেছিল এবং প্রকাশকের সঙ্গে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা করেছিল—কেন তারা এরকম অশ্লীল গল্প ছাপে, তাদের কি বিবেক বা নীতিবোধ বলে কোন পদার্থ নেই? এ কাহিনী জ্যোতিরিন্দ্রবাবু নিজেই আমাদের শুনিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরেই আমার তাৎক্ষণিক এবং আচমকা আক্রমণ।

তিনি তখনও বিষণ্নমুখ, দ্বিধাগ্রস্ত, চিন্তিত। দাঁড়িয়ে। কে যেন বলল, আরে, বসুন না, বসুন। তিনি বসতেই আমি পুনরায় আরম্ভ করলাম, কি করেছেন আপনি? বারটা ঘর ভাঙলেন, এতগুলো বাসিন্দা, এতগুলো চরিত্র, সব ক'টাকেই আপনি পশুত্বের পর্যায়ে রেখে দিলেন, একটাও মানুষ উপহার দিতে পারলেন না আমাদের?

তাঁর শঙ্কিত জিজ্ঞাসা, কিরকম?

—আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন। আচ্ছা, ঐ মাস্টার চরিত্রের কথাই ধরুন। আজীবন শিক্ষাব্রতী একজন মানুষ অভাবের তাড়নায় নিজের মেয়েকে dignity of labour স্লোগানে মাসেজ ক্লিনিকে তুলে

দিচ্ছে, বেকার ছেলেকে এর দালালীতে নিয়োগ করছে। ভয়ংকর এক পরিস্থিতি। অথচ, তার জন্য কোন স্তরেই তার কোন দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, বিবেকদংশন নেই। এ কি একটা গ্রহণযোগ্য কথা হলো ?

—আমি যে এদের দেখেছি।

—তা দেখতে পারেন। কিন্তু সে তো শিক্ষক ; তার নীতিবোধ সামাজিক মূল্যবোধ, শুভবুদ্ধি, সংস্কার, সৎ-অসতের ভাবনা, ইত্যাদি থাকার কথা। শিক্ষক শব্দটির সঙ্গে এ জিনিসগুলোর সংযোগ অঙ্গাঙ্গী। কিন্তু কোথায় ? আপনার শিক্ষক তো কোথায়ও ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবনায় উদ্বেল হয় নি, কোথায়ও গোপনে আত্মজিজ্ঞাসায় ছিন্নভিন্ন হয় নি, কাঁদে নি, দুঃখবেদনায়, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয় নি। তাছাড়া, তার স্ত্রী, মেয়ের মা। তার তো শঙ্কিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার কণ্ঠেও তো কোন ধিক্কার নেই, আতঙ্ক নেই, স্বামীর আচরণের বিরুদ্ধে কোন ক্রোধ নেই, প্রতিবাদ নেই। তার মাতৃসুলভ মমতাও কি নিঃশেষিত ! এইসব তৃণখণ্ডের মত স্রোতে-ভাসা জীবগুলোকে আপনি মানুষ বলতে চান ?

তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, আহা, আমি যে চাক্ষুষ ওদের দেখেছি, সত্যি বলছি দেখেছি।

অন্য একজন আমার বক্তব্যের সূত্র ধরে বললেন, দেখতে পারেন। কিন্তু সব বাস্তবই কি সাহিত্যের বাস্তব ? আপনি যদি ঐ শিক্ষককে কোন এক মুহূর্তে আত্মধিক্কারে নিমজ্জিত হতে দিতেন, অথবা মেয়ের মার চোখে দু-চার ফোঁটা জল এনে দিতেন, অথবা গোপন ব্যথায় হারিয়ে যাওয়া নীতিবোধের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলত, তা হলেই তো ঐ পশুগুলো মানুষ হয়ে ফুটে উঠত। কিন্তু হলো কি ? অথচ, দেখুন, কী নিপুণ আপনার রচনা। এতগুলো চরিত্র, কোন একটা অন্য কোন চরিত্রের মধ্যে হারিয়ে যায় নি।

আত্মপক্ষ সমর্থনে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু আবার নিষ্প্রভভাবে বললেন, আমি যে বেলেঘাটার বস্তিতে ওদের সঙ্গে থেকেছি। যা দেখেছি তাই এঁকেছি, কিচ্ছু বানাই নি।

নচভ (নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য) সংযোগ করলেন, আপনি করেছেন কি নন্দী মশাই, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণের হাতে ক্ষুর-কাঁচি ধরিয়ে দিলেন ?

পুনশ্চ উল্লেখ্য, উপন্যাসে পাঁচু ভাদুড়ি নামে একটি চরিত্র আছে, যে সেলুন খুলে নাপিতগিরি করে সংসার চালাত। শুনে জ্যোতিবাবু একটু হাসলেন, কিন্তু জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, ঐ ব্যাটাকে আমি বিলক্ষণ চিনি।

নচভ আবার বললেন, তাহোক, তবু তো বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আমাদের ইজ্জতে লাগে না! ওকে দিয়ে আপনি একটা লণ্ড্রি তো খোলাতে পারতেন, কিন্তু ক্ষুর-কাঁচি! কি করলেন ?

এসব টিপ্পনিতে পরিবেশ ঈষৎ হালকা হলেও জ্যোতিবাবু কিন্তু কোনমতেই স্বস্তি বোধ করতে পারছিলেন না। চোখেমুখে চিন্তাকুল বিষণ্ণতা। অপর একজন আক্রমণের দায়িত্ব নিল—তারপর দেখুন, আপনার একটি ঘরে দেখছি স্ত্রী বহুবল্লভা হয়ে উঠেছে, কিন্তু স্বামী নির্বিকার, নিস্পৃহ ; অন্য এক ঘরের শিক্ষিতা তরুণী পিতামাতার জ্ঞাতসারেই পয়সাওয়ালা চাকুরের উপপত্নী রূপে বসবাসের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কোন ঘরে কোন স্তরেই কোন ক্রোধ নেই, বিক্ষোভ নেই ; এ কি ধরনের পৃথিবী আপনি আঁকলেন বলুন তো ?

—আরে বাবা, আমি যে তাই দেখেছি।

—আপনি তো আমাদেরও দেখছেন, কৈ, আমরা তো আপনার উপন্যাসে আসছি না। বলুন ?

তিনি উত্তর দিলেন না, হাসলেন। আমি এবার বললাম, আপনি শুধু স্রোতে-ভাসা মানুষগুলোকে দেখালেন, কিন্তু এ ছাড়াও যে মানুষ আছে, আছে প্রতিরোধ, আছে সংগ্রাম, সে সব কি কখনও আপনার চোখে পড়ে না ? বারটা ঘর আপনি ভাঙলেন, কিন্তু কোন ঘরেই কি আমরা ট্র্যাজিডি পেলাম ?

অন্য একজন সংযোগ করলেন, সত্যিই তো, যেখানে প্রতিরোধ নেই

সেখানে ট্র্যাজিডিও নেই। অথচ আপনার এমন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, এমন স্বচ্ছ ভাষা, আপনার 'বার ঘর' অনায়াসেই সহরতলী জীবনের মহাকাব্য বলে স্বীকৃত হতে পারত।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু নিশ্চুপ। আমি বক্তব্য বিস্তৃততর করে বললাম, কিন্তু পারল না, একমাত্র মানবিক গুণের অভাবে। আপনি কি শুধু এই ধরনের অমানবিক পৃথিবীই আমাদের উপহার দেবেন, আর কিছু দেবেন না? দেবেন না মানুষ?

সেই সন্ধ্যার আলোচনা এই ধারায় অব্যাহত থাকল। আলোচনা মানে জ্যোতিবাবুকে বাণবিদ্ধ করা। আত্মপক্ষ সমর্থনে ওঁর আর কোন শক্তি ছিল না। প্রতিপক্ষ প্রবল, সংখ্যায়ও বহু। সুতরাং, তিনি নীরবতাকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বিবেচনা করে মৌনী হলেন। ভীষণ উদ্বিগ্ন, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন যেন। তারপর হঠাৎ একসময় কিছু না বলেই চলে গেলেন। আক্রমণের তীব্র অতিশয়তা নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ বলাবলি করলাম। বাংলা উপন্যাসে মানবিকতার অবক্ষয় কিভাবে নতুন নতুন দিগন্তে বিস্তৃত হচ্ছে, সে বিষয়ে মত-বিনিময়ও হলো।

পরদিনই বিকেলে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এসে উপস্থিত। আমি বসে ছিলাম, অন্য বিশেষ কেউ তখনও আসে নি। বসেই তিনি বলতে লাগলেন, জানেন, অরবিন্দবাবু, কাল সারারাত আমি ঘুমুতে পারি নি। এক বিন্দুও না। খালি ভেবেছি, আপনারা ঠিকই বলেছেন, আমি শুধু পশুই সৃষ্টি করেছি। বেলেঘাটার বস্তিতে আমি ছিলাম এক সময়, ঐ কুৎসিত জীবনটাকে আমি অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছি, দেখেছি কী কদর্য আত্ম-বিক্রয় ওদের। আর জানেন তো, আমার যা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, তাই আমার লেখায় প্রবলভাবে আসে। এটাকে যে অন্য প্রেক্ষিত থেকে উপস্থাপন করা যায়, সেটা কখনও ভাবি নি। নাঃ, এখন থেকে সত্যিই অন্য মানুষ আবিষ্কার করতে হবে।

এবার আমার পালা। বললাম, সত্যি, আমার নিজেরও খুব খারাপ

লাগছিল, কাল সন্ধ্যায় আমরা সবাই মিলে আপনাকে এমন জব্দ করলাম।

—না, না, আপনারা যথার্থ সমালোচনাই করেছেন। কঠোর হলেও আমি সেটা মেনে নিয়েছি।

—জানেন জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, আমরা সবাই আপনার লেখার খুব ভক্ত। এমন আশ্চর্য মুন্সীয়ানা সত্যি দুর্লভ। তাই, আপনার শক্তি মহৎ সৃষ্টির পথে না গিয়ে এমনভাবে নিঃশেষিত হবে, ভেবে আমরা দুঃখ পাই। আপনার প্রতি অনুরাগ আছে বলেই, তো ঐভাবে আঘাত করতে পেরেছি।

তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি নতুন পথে বাঁক নিয়েছিল কিনা জানি না। তবে, তাঁর অনুশোচনা সহৃদয় বলে মনে হয়েছিল। অতীত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে নিজের প্রত্যয়কে পুনরায় ঘোষণা করলে বলতে দ্বিধা নেই আমার, বাণিজ্যিক শিল্পকে আমি ঘৃণা করি। শ্রদ্ধা করি সেইসব একাগ্রচিত্ত শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদের যারা মানুষের মূক ব্যথাগুলোর সঙ্গে অন্বিত হওয়ার জন্য সতত ব্যাকুল। কারণ, এপথেই শিল্প মহৎ এবং শিল্পের মাধ্যমে শিল্পী মহান বলে স্বীকৃতি লাভ করে। আমার আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে যদি আমার কাল, আমার কালের মানুষ এবং তার মর্মবেদনা অভিব্যক্তি লাভ না করে, তাহলে আমি যে আমার কালে বিচরণশীল এবং জীবিত, তার রূপান্তরের ভাবনায় উদ্বিগ্ন, তার স্বাক্ষর কোথায় ?

॥ ৩ ॥

যেসব সমস্যা আমাদের কালকে, স্বদেশকে এবং মনুষ্যত্বকে ক্ষতবিক্ষত, কলুষযুক্ত এবং বিদীর্ণ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় গোঁড়ামি, দ্বি-জাতি তত্ত্ব, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ইত্যাদি, এবং এর ফলশ্রুতি—হিংসা, রক্তারক্তি, আত্মবিনাশের প্রবণতা।

ইণ্ডিয়ানার একদিনের আড্ডায় এই প্রশ্নটি অতিশয় আত্যন্তিকতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছিল অচিন্ত্য সেনগুপ্তর একটি প্রশ্নে। প্রশ্নটি তিনি সমবেত কয়েকজনকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়েছিলেন—পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে কে করেছে ?

তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, এসেছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আহ্বানে। তবে, একটি পশ্চাদ্‌পট ছিল। সেটা ১৯৪৭ কি ১৯৪৮ সন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন একটি দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ সংকলন গ্রন্থ অথবা দলীয় সাপ্তাহিকের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের তোড়জোড় চলছিল। ওঁর একটি গল্প সংকলন-গ্রন্থটিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করুক—আমরা দারুণ আগ্রহী ছিলাম। তিনি তখন কলকাতার বাইরে, কর্মরত। আমার উপর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল বলে গল্প পাঠিয়ে আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি আনুকূল্য করার অনুরোধ জানিয়ে আমি ওঁকে একটি চিঠি লিখি। উত্তর এলো—ভীষণ ব্যস্ত, সময়াভাব। এই অজুহাত মেনে নেওয়ার অভিপ্রায় আমাদের মোটেই ছিল না। দ্বিতীয় পত্র গেল, যথার্থ সম্মানদক্ষিণার প্রতিশ্রুতিসহ। এবার জবাব এলো, সমস্ত কাজকর্ম ফেলে রেখে যদি আমাদের জন্য গল্প লিখতে বসেন এবং তজ্জন্য পঞ্চাশটি মুদ্রা সম্মানদক্ষিণা দাবি করেন তবে তা কি খুব অসঙ্গত হবে ? আমার তৃতীয় পত্রে এই সর্ত মেনে নিয়ে লেখা হলো, তথাস্তু। সাত-আটদিন বাদেই গল্প এলো ; যতদূর স্মরণে আসে গল্পের নাম ছিল 'ধান'। প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সম্মান দক্ষিণাটাও পাঠানো হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, অচিন্ত্যবাবুর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে আমরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। পরিচয় পর্বের পর বীরেনবাবুর সঙ্গে কবিতা সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা, এবং তারপর পূর্ব বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কিছু রঙ্গ-পরিহাস পরিবেষণ করলেন তিনি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সকলের উদ্দেশে এই প্রশ্নটি নিক্ষেপ করলেন, আচ্ছা বলুন তো পাকিস্তান কারা করেছে ?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় বিস্মিত কে একজন উত্তরে বলল, পাকিস্তান তো মুসলিম লীগের দাবি ছিল।

—তার মানে আপনি বলতে চান মুসলমানরাই পাকিস্তান করেছে। ভুল, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পাকিস্তান করেছে হিন্দুরা—

দু-তিনজন একই সঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করল, হিন্দুরা ?

—হ্যাঁ, হিন্দুরা। হিন্দুরাই পাকিস্তান করেছে। একবার ফিরে যান আপনাদের বাল্যকালে, স্মরণ করে দেখুন একটি হিন্দু বাড়িতে একজন মুসলমানের আবির্ভাব ঘটলে তাকে কিভাবে সম্বর্ধনা করা হতো, কোথায় তাকে বসতে দেওয়া হতো, তার পান-তামাকের কি ব্যবস্থা ছিল ; সেই অভ্যর্থনায় তার প্রতি মানুষ হিসাবে কোন মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল কি ? না দেওয়া হয়েছিল অবজ্ঞা আর ঘৃণা ? মনে পড়ছে ছবিটা ? শত শত বছরের এই অবজ্ঞা আর ঘৃণা জমে জমে যে পাহাড় হয়ে গিয়েছিল, একদিন এর বিস্ফোরণ ঘটবে না ? তাই ঘটেছে। হিন্দু সমাজ সংগঠনের ঘৃণার পাহাড় ফুঁসতে ফুঁসতে ফেটে পড়েছে, করেছে পাকিস্তান……

তাঁর কণ্ঠে উত্তাপ ছিল, ছিল বেদনা ও ক্ষোভ। তিনি অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন, আর আমি স্মৃতির রেখা ধরে যাচ্ছিলাম পেছনের দিকে। যেতে যেতে পৌঁছালাম আমাদের পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে, বাল্যকালের একটি সকালে। স্পষ্ট রেখায় টানা একটি চিত্র ভেসে উঠল। দেখলাম, আমাদের গ্রামের একজন প্রৌঢ় মুসলমান আমাদের বাড়ির অন্য এক হিস্যার কর্তার নিকট কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন, 'তুমি কি করলা কাকা, আমার শেষ কাণি জমিটুকুও তুমি কাইড়া নিলা। অখন আমি কি করি, কি খাই, কও কাকা, কও।' কর্তা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, 'আমি কি করমু কও, রাজার আইন, আইনে যা কয় তাই ত হইব।' একপক্ষে বুক-ফাটা কান্না আর হা-হুতাশ,অন্য পক্ষে ফিকে মিষ্টি কথার আশ্বাস—খোদা নিশ্চয় মুখ তুলে চাইবেন, ইত্যাদি। সময় আসে যখন আবেগের অতিশয্যতা নিঃশেষিত হয়, কান্না থামে ; তামাক আসে,

আর কর্তা তার হাতে পাঁচ-দশ টাকা গুঁজেও দেন। ঘটে দৃশ্যান্তর। তার চলে যাওয়ার পর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তার বসবার জমিটুকু গোবর জলে লেপন করা হলো।

বাল্যকালের অতীত থেকে আমি যখন আড্ডার বর্তমানে ফিরে এলাম, তখন শুনতে পেলাম অচিন্ত্যবাবুর মন্তব্য, এর পরেও কি আপনারা বলবেন যে পাকিস্তান হিন্দুরা করে নি ?

সাম্রাজবাদী কূটনীতি ও স্বদেশী কায়েমী স্বার্থবাদীদের রাজনীতি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত না করলে শুধু মানবিক সম্পর্কের প্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে অচিন্ত্যবাবুর যুক্তি অখণ্ডনীয়। ধর্মশাসিত এবং বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার স্তরে স্তরে মানুষে মানুষে অনৈক্য, বিরোধ, হিংসা এবং প্রতিহিংসা সুসংহত রাখা হয়েছিল। আর, এরই পীড়নে মানুষের মনুষ্যত্বকে অমর্যাদা ও অস্বীকার করা হচ্ছিল হাজার হাজার বছর ধরে। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের নির্মমতা এবং কর্মবাদী জীবনদর্শন ছিল প্রতিবাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরটুকু হরণ করার কার্যকর হাতিয়ার। তাই ক্রোধ পুঞ্জীভূত হতে পারে নি, বিস্ফোরণও ঘটে নি। কিন্তু, আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই বিখ্যাত উক্তির নিয়ম তো সর্বক্ষেত্রেই সংগোপনে কাজ করে চলে—অল্প সংখ্যক মানুষকে বহু দিনের জন্য, বহু সংখ্যক মানুষকে অল্প দিনের জন্য বঞ্চনা করা যায় ; কিন্তু, সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বঞ্চিত করা যায় না। ভারতবর্ষেও যায় নি। কণ্ঠহীন কণ্ঠ পেয়েছে, বিবশ মনুষ্যত্ব সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে, প্রতিকারের আশায় ঘটিয়েছে বিস্ফোরণ। সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্র সামাজিক বিরোধ ও অনৈক্যের ভিত্তিতে তার কূটনীতি পরিচালনা করেছে, তাতে সংযুক্ত করেছে তার দুঃশাসনের অভিশাপ। কালের আবর্তে যা ছিল অবধারিত তাই ঘটল—নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় অবস্থানকারী মানুষের জীবন হলো লণ্ডভণ্ড, মানবিক সত্তা হলো খণ্ড বিখণ্ড। সেই বিপর্যয়ের ময়না তদন্তে বসে, দীর্ঘ ব্যবধানের পর, নিজের এবং পূর্বপুরুষদের অদূরদর্শিতার অপরাধ যদি স্বীকার না করি, তাহলে নিজের মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করা

হয় না কি ? ইণ্ডিয়ানায় বসে অচিন্ত্যবাবুর সেদিনকার অকপট আত্ম সমালোচনা সেজন্যই আমার মনে হয়েছিল মূল্যবান।

তবে, আত্মসমালোচনার আত্যন্তিক গরজে কারও কারও মধ্যে সাক্ষীগোপাল অনুসন্ধান করার প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যায়। সেজন্য অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র রয়েছেন; হাল আমলের রমেশচন্দ্র মজুমদারও ব্যবহৃত হয়েছেন। তেমনি এক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল এক বঙ্কিম-স্মরণ সভায় (বয়েজ ওন লাইব্রেরী ও ইনস্টিট্যুট কর্তৃক আয়োজিত, ২৪. ২. ১৯৭৯)। সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব ছিল। বক্তাদের মধ্যে জনৈক অধ্যাপক পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য সরাসরি বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর 'আনন্দমঠ'-কে দায়ী করে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর প্রতিবেদন শেষ হওয়া মাত্রই শ্রোতাদের মধ্য থেকে দু'জন আমাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন উত্থাপন করেন—রেনেসাঁসের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য এবং বিকাশমান ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতিকে পটভূমি রূপে ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভঙ্গির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার জন্য। প্রস্তুত ছিলাম না, কিন্তু উপস্থিত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হয়। সেজন্য প্রেক্ষিত যেমন সুব্যাপ্ত হলো, তেমনি এর উন্মোচনে সময়ও লাগল সুদীর্ঘ। তাছাড়া, পূর্ববর্তী বক্তার উদ্ধত মন্তব্যের প্রতিবাদ করার তাৎক্ষণিক গুরুত্বও ছিল প্রবল।

বঙ্কিমচন্দ্র ইসলামবিরোধী ছিলেন কি ছিলেন না, সেটা বিতর্কের বিষয়বস্তু হতে পারে। কিন্তু, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করে তাঁকে পাকিস্তান সৃষ্টির মূল আসামী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা যুক্তির দিক থেকে যেমন অর্বাচীন, বিবেচনার দিক থেকে তেমনি অ-প্রাজ্ঞ। এই উপন্যাসের একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে সন্তানরা একটি মুসলমান গ্রামে অগ্নি-সংযোগ ও লুটপাট করছে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ঘটনাটি মৌলকাহিনী বৃত্তের সম্পূর্ণ বাইরে স্থাপিত; সুতরাং অপ্রয়োজনীয়। একটি অপ্রয়োজনীয় ঘটনাকে উপন্যাসে উপস্থাপন করা শিল্পবিচারে নিন্দনীয়, সন্দেহ নেই। এই অধ্যায়টি পাঠ করে কোন অসহিষ্ণু মুসলমান পাঠকের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, লেখকের

প্রতি বিরূপ হওয়া আর পাকিস্তান দাবি কি সমার্থক ? তাছাড়া, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উপন্যাসটির সামগ্রিক আবেদন কি। এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর—আনন্দমঠের আবেদন কোন অর্থেই সাম্প্রদায়িক নয়, এর আবেদন জাতীয়তাবাদের আবেদন। এই গ্রন্থ পাঠ করে হিন্দু পাঠক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা লাভ করেছে, মুসলমানবিরোধী সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হয় নি। আমাদের অভিজ্ঞতায় এর কোন প্রমাণ নেই। আরও বিচার্য বিষয় হলো, পাকিস্তান আন্দোলন চলার কালে ভারতবর্ষের শিক্ষিতের হার কত ছিল, বই পড়া লোকের সংখ্যা ছিল কত, কোন্ কোন্ ভাষায় 'আনন্দমঠ' অনূদিত হয়েছিল, এসব পরিসংখ্যান সংগ্রহ করলে প্রমাণিত হবে যে, সে সময়ে 'আনন্দমঠ'-পড়া লোকের সংখ্যা ছিল সমগ্র জনসমষ্টির ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ। সে সময়কার ভারতবর্ষ প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষের দেশ। যারা কস্মিনকালেও বঙ্কিমচন্দ্রের নাম শোনে নি, বই পড়া দূরস্থান, তারা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য প্রমত্ত হতে পারে, তা সুস্থ যুক্তি বুদ্ধির অগম্য।

সেদিনকার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আমি অচিন্ত্যবাবুর প্রশ্নের কথা উল্লেখ করি, উন্মোচিত করি আমার বাল্যস্মৃতির কাহিনী এবং তখন আবেগউত্তপ্ত এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, পাকিস্তানের জন্য একাকী বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষারোপ করে লাভ নেই, আমরা প্রত্যেকেই অপরাধী। শ্রোতাদের মধ্যে যারা আছেন তারা, তাদের ঠাকুরদারা তাদের ঠাকুরদারা তাদের ঠাকুরদারা তাদের ঠাকুরদারা আমরা পুরুষানুক্রমে সকলেই এই কলঙ্কের ভাগীদার। মনুষ্যত্বের অবমাননার অপরাধে আমরা প্রত্যেকে অপরাধী। সমগ্র প্রসঙ্গটি পটভূমির বিশালতায় সংস্থাপন করতে পারায় আমার আত্মতৃপ্তি লাভের কারণ ঘটেছিল। আজ এই বিষয় লিখতে বসে ভাবি, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো যদি ঐক্যের বদলে অনৈক্য প্রচার না করত এবং সমাজ-বিধায়কগণ নজরুলের ভাষায় জাতের নামে বজ্জাতি না করত তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই কলঙ্কপূর্ণ অধ্যায়টি কোন দিনই রচিত হতো না।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মশাসিত ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবন আজও কতটা সজীব এবং জাতীয় ও জাগতিক স্বার্থ ও কল্যাণের পক্ষে তা কতটা সহায়ক ও অনুকূল, আজকের ভারতবর্ষে এ প্রশ্নটি বোধ করি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মবোধের উৎস, উৎপত্তি ; বিবর্তন বিভিন্ন সমাজ সংগঠনের সঙ্গে তার সম্পর্ক, পারমার্থিক মোক্ষলাভের আদর্শ অবলম্বন করে সামাজিক স্তরে এর ব্যাপ্তি, ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান এ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাদর্শগুলো মানবিক পৃথিবীতে যে সব সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যার অসহনীয় প্রমত্ততায় আমাদের ব্যক্তিক এবং ভৌগোলিক সত্তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, রক্তাক্ত এক অসহায়তায় আমরা মুহ্যমান হয়ে পড়ছি, সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং সমাধান অন্বেষণ আমাদের কালের আত্যন্তিক গরজ।

প্রথম যৌবনে জোনাথন সুইফ্‌টের লেখায় পাঠ করেছিলাম, উই হ্যাভ ইনাফ রিলিজিয়ন টু হেট ঈচ্‌ আদার, বাট নট ইনাফ টু লাভ ঈচ্‌ আদার (পরস্পরকে ঘৃণা করার ধর্ম আমাদের অনেক, কিন্তু পরস্পরকে ভালোবাসার ধর্ম যথেষ্ট নেই)। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতগুলোর চরিত্র বিশ্লেষণে এর চেয়ে খাঁটি সত্য আর কিছু হতে পারে না। অথচ, প্রত্যেকটি ধর্মের নির্যাসই তো হলো মানবিক ঐক্য, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, নির্বিশেষে সব মানুষের হাত ধরা। কিন্তু এই বিমল আদর্শ কোন কালেই মানবিক ভুবনে সত্য হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো না, হতে পারল না। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় নেতাদের গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা, আপন আপন শ্রেষ্ঠতা ও মহত্ত্বের দাবি, ইত্যাদি মানবগোষ্ঠীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল, আত্মিক মিলনে বাঁধতে পারল না। মানুষের ইতিহাস তো কলঙ্কিত হয়ে আছে ধর্মীয় কলহে, যুদ্ধে, জেহাদে। সত্য বলতে কি, ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ধর্মের জিগিরে, আর এমন সব ধর্মীয় নেতার নির্দেশে যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে পরম নিষ্ঠাবান বলে সুপরিচিত ছিলেন। রোমান ক্যাথলিকরা এক সময়ে প্রোটেস্টানদের এবং প্রোটেস্টানরা ক্যাথলিকদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে, খৃষ্টানরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে এবং খৃষ্টান ও মুসলমানরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

বৃটিশ ভারতের ইতিহাস কলঙ্কিত হয়ে আছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় আর এর অনিবার্য ফলশ্রুতি অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি ও জিঘাংসায়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষকে কী সর্বনাশা উন্মত্ততায় ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে, তার স্বাক্ষর লিখিত রয়েছে আজকের ইরাণ, লেবানন, ইস্রায়েল, পাকিস্তান, ভারতবর্ষে। এই কলঙ্ক তো মানুষেরই ইতিহাসের, আর তাকে নির্মূল করার উপায়ও মানুষকেই উদ্ভাবন করতে হবে।

১৯৪৭-৪৮ সনের কলকাতা। বিভক্ত ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক চোরা-গুপ্তি আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ তখনও চলছিল। আমাদের দলীয় অফিস সে সময়ে ছিল শিয়ালদহ-বৌবাজার সংযোগস্থলের নিকট একটি দোতলা বাড়িতে। একদিন, অতি প্রত্যুষে, বিকট এক নারীকণ্ঠের চীৎকারে ঘুম ভাঙল। ধড়ফড়িয়ে উঠে দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি একজন মহিলা, সর্বাঙ্গ দাউ দাউ আগুনে জ্বলছে, বিকটতর চীৎকার এবং অসহায়তায় একটা ল্যাম্প-পোস্ট আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে, একটা জ্বলন্ত ঘোড়ার গাড়ি প্রাণপণ ছুটছে উত্তর দিকে, দু-তিনজন পুরুষও দিগ্‌বিদিক ছুটছে, কোন দিক থেকে ঠিক ঠাহর করতে পারি নি দু-তিনটে গুলির শব্দ ভেসে এলো—পুলিশের। পুলিশদের একজন ঐ মহিলার সহায়তায় এগিয়ে এলো। আর দেখতে পারলাম না ; ঐ বীভৎস দৃশ্য আমার সর্বাঙ্গে এক আতঙ্ক ও শিহরন সঞ্চারিত করল, শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল, সারা দিনরাত্রি থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল ; আর মন হয়ে রইল বিবশ আচ্ছন্নতায় নিথর। বারংবার এই প্রশ্ন মনে তোলপাড় সৃষ্টি করতে লাগল—কেন ? কেন ? কেন এই প্রমত্ততা, বিভীষিকা ? আজও যখন ঐ ঘটনা স্মরণ করি, আমার দেহমন কণ্টকিত হয়।

এবংবিধ ঘটনা আজও ঘটে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, ভিন্ন অবয়বে। প্রশ্ন এই, ঘটবে কেন ? ঘটছে, তার কারণ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মান্ধতা লালিত হয়েছে, এবং লালিত হয়ে তার হিংস্র তাণ্ডব মানুষের শুভবুদ্ধিকে হত্যা করতে উদ্যত। ধর্মান্ধতার যে ঐতিহ্য

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো উত্তরাধিকার স্বরূপ লাভ করেছে, তার চৌহদ্দি এরা অতিক্রম করতে একান্তই নারাজ। কারণ, সীমানা লঙ্ঘন করার অর্থই রূপান্তর। পরিবর্তনে, রূপান্তরে এদের ভয়ংকর আতঙ্ক। অথচ, মানব ইতিহাসের বর্তমান পর্বে রূপান্তর প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। কালের এই নীরব সংকেত যতই অনুভূত হচ্ছে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ততই অধিকতর উত্তেজিত ও জেহাদী মনোভাব অবলম্বন করছে। তাই, দুশ' বছর বাদে আমরা নতুন করে সুইফ্টের পূর্বোক্ত উক্তির সত্যতার প্রমাণ লাভ করছি।

ধর্মীয় বৈরিতার আদি উৎস অবশ্য এদের আপন আপন ঈশ্বর-ভাবনা। ঈশ্বর নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন ভাবনা অথবা দুর্ভাবনা নেই। তবে, ঈশ্বর-আশ্রিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমত মানবিক ভুবনে পূর্ব-আলোচিত যে বিষ সঞ্চালিত করেছে তা নিয়ে আমি বিলক্ষণ চিন্তিত; প্রত্যেক বিবেকবান মানুষই চিন্তিত হবে। গভীরভাবে একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হবে যে, ঈশ্বর-ভাবনা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল থাকে; সামাজিক অধিষ্ঠানের চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ঈশ্বর-ভাবনাকে বিচিত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করে। অসংখ্য খণ্ড খণ্ড বিভাজনের মধ্যে প্রবেশ না করে তিনটি মুখ্য স্তরের কথা উল্লেখ করা যাক। প্রথমে ধরা যাক সমাজের বিধায়ক ও শাসক-গোষ্ঠীর কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং তথাকথিত মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষাকে আলোচনার মধ্যে না এনে তাদের ধর্মাচরণের সামাজিক তাৎপর্য গ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তারা তাদের সামাজিক স্থিতি ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে ঈশ্বর-ভাবনাকে ব্যবহার করে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের সমস্বার্থের ঐক্য ও আঁতাত গড়ে ওঠে। কারণ, তাদের দাক্ষিণ্যের উপর ঐসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তাছাড়া, বদান্যতার নিদর্শন হিসাবে তারা যেসব বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ইত্যাদি নির্মাণ করে, ঈশ্বরের নিকট তাদের নিবেদিত অর্ঘ্য—যেন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তি দুর্বল না

হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজরা যখন কোন দুর্বল দেশ আক্রমণ করে তখন যুদ্ধে জয়লাভের আশায় তারা সমবেত কণ্ঠে গীর্জায় মন্দিরে মসজিদে প্রার্থনা জানায়, পূজো দেয়। অধ্যাপক আর. এইচ. টনির গ্রন্থ 'রিলিজিয়ন এণ্ড দ্য রাইজ অব ক্যাপিট্যালিজম্'—এ একদা পড়েছিলাম, ইওরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও বিবর্ধনে পুঁজিপতিরা কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আশ্রয় লাভ করেছে এবং তাদের শিল্পবাণিজ্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। এর নজির প্রতিটি দেশেই পাওয়া যাবে।

তারপর ধরা যাক সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর ও অবদমিত সংখ্যাহীন মানুষদের কথা, যারা শোষিত নিপীড়িত হয়ে সহায়সম্বলহীন অসহায় অস্তিত্ব বহন করে ; তাদের ঈশ্বর-ভাবনায় যুক্ত হয় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের চরিতার্থতার কল্পনা। তাদের ঈশ্বর দুঃখবেদনা ক্রন্দনের প্রতিমূর্তি এবং শোষণ-অত্যাচার থেকে মুক্তির প্রতীক। কোন এক দিন, ইতিহাসের কোন এক বিন্দুতে সে পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হবে এবং জাগতিক অন্যায় অবিচারের অবসান ঘটিয়ে অবিনশ্বর কল্যাণ ও শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

তাদের এই স্বপ্নকে উজ্জীবিত রেখে এবং কার্যত তাকেই মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে ধর্মীয় অনুশাসনের এক কাঠামো সৃষ্টি করে আছে আরও একদল মানুষ, যারা ধর্মকে একটি বাণিজ্যিক পণ্যরূপে ব্যবহার করে। জাতীয় ধনোৎপাদনে তাদের কোন ভূমিকা নেই ; তারা সম্পূর্ণ পরজীবী, কঠোর হলেও একান্ত সত্য অর্থে সামাজিক পরগাছা। তারা কেউ গুরু, কেউ মোল্লা, কেউ সন্ত, কেউ পাদ্রী রূপে অজ্ঞ মানুষের নিকট ঈশ্বরসান্নিধ্যে মুক্তি এবং কাল্পনিক স্বর্গীয় সুখ বিক্রয় করে। এই বাণিজ্য যাতে যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থাকে সেইজন্য তারা মানুষকে কুসংস্কারে নিমজ্জিত রাখা এবং যুক্তি-আশ্রয়ী চিন্তা ও মনোভঙ্গি বিকাশে বাধা দেয় শাস্ত্রীয় অনুশাসনের নামে। জন-সমষ্টির উপর তাদের অসামান্য প্রভাবের উৎস হলো জনসাধারণের অজ্ঞতা, সংগ্রামবিমুখ অসহায়তা এবং জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও ভয়। শুধু তাই নয়,

স্বয়ং ঈশ্বর সেজে তারা মানুষকে প্রতারিতও করে। পরম্পরাগতভাবে ঈশ্বরভাবনা তাদের নিকট বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত।

এই শেষোক্ত স্বর্গীয় সুখের কারবারীদের সম্পর্কে আমার স্কুলের পণ্ডিত মশাই—বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য—একদিন আমাকে একটি উপাদেয় গল্প শুনিয়েছিলেন। পণ্ডিত মশাই-এর বাসস্থান ময়মনসিংহের দুর্গাবাড়ির লাগোয়া। একদিন লক্ষ্য করলেন, একজন দক্ষিণ ভারতীয় পরিব্রাজক দুর্গাবাড়িতে প্রবেশ করল। ময়মনসিংহের মত একটি দূর প্রান্তের সহরে একটি দক্ষিণ ভারতীয় তিলকচর্চিত মুখ নিঃসন্দেহে ছিল কৌতূহলের বস্তু। সেই কৌতূহলের বশেই তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, বেরুলেই ঐ পরিব্রাজককে পাকড়াও করবেন। করলেনও। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা সঙ্গত যে পণ্ডিত মশাই ছিলেন সে আমলের গ্র্যাজুয়েট ; সুতরাং ইংরেজী সংলাপে অনভ্যস্ত ছিলেন না। প্রশ্ন করে জানা গেল, সেই পরিব্রাজক সে সময়ে বঙ্গদেশ পরিক্রমা করছিল ; উদ্দেশ্য, বাঙালী হিন্দুদের দেবস্থান এবং উপাসনা কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। সংলাপের পরবর্তী অংশটুকু পণ্ডিত মশাই এভাবে আমার নিকট পরিবেষণ করেছিলেন—

'হোয়াট ইজ ইওর ইম্‌প্রেশন এবাউট বেঙ্গল ?'

'প্রশ্নটা শুনে তিনি ঈষৎ হাসলেন। একটু থামলেন। তারপর উত্তর দিলেন, বেঙ্গল ইজ এ ভেরি নাইস গড্‌-প্রোডিউসিং কান্ট্রি।

'গড্‌-প্রোডিউসিং ? আমার বিস্ময়াবিষ্ট প্রশ্ন।

'ইয়েস, গড্‌-প্রোডিউসিং।

'আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না দেখে তিনি বলতে লাগলেন, যেখানে গিয়েছি সেখানেই জানতে পেরেছি সাক্ষাৎ ভগবান। রাম ঠাকুরের আশ্রমে গেলাম, শুনলাম তিনি সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন। অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমে গেলাম, সেখানেও ঐ একই বয়ান—সাক্ষাৎ ভগবান। ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের শিষ্যদের নিকট শুনতে পেলাম, তিনিও তাই, সাক্ষাৎ ভগবান। এমনি কত সাক্ষাৎ ভগবানের যে সন্ধান পেয়েছি

তার ইয়ত্তা নেই। এত সংখ্যক ভগবান উৎপন্ন করেছে বলেই আমি বঙ্গদেশকে গড্-প্রোডিউসিং কান্ট্রি আখ্যা দিয়েছি। তার ঠোঁটে ছিল তীক্ষ্ণ শ্লেষমিশ্রিত হাসি।'

গল্পটা বলে পণ্ডিত মশাই বললেন, এমন একটা নগ্ন সত্য এমন চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে, তা ছিল আমার ধারণার অতীত। জানিস, তখন আমার কি ইচ্ছে করছিল—আমার ইচ্ছে করছিল ঐ ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরে আনন্দ করি।

আমাদের কাল যে নৃশংস রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তাকে প্রেক্ষাপটে রেখে ঐকান্তিকভাবে অনুভব করি, সামাজিক চৈতন্যকে পরিচ্ছন্ন, কুসংস্কারমুক্ত, যুক্তি ও প্রগতির পথে সম্মুখের পানে ধাবমান রাখার জন্য ঐসব ভগবানদের অস্তিত্বের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। যেমন প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব এবং জাতীয় ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টির ক্ষমতার অবসান ঘটানো। কারণ, সেগুলো মিলনের নয় বিরোধের, সংহতির নয় বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করে চলেছে; এদের প্রভাবে ব্যক্তিমানস সামগ্রিক বোধে, বৃহত্তর মানবিক শ্রেয়সের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে পারছে না।

একজন বর্ষীয়ান ব্রাহ্ম, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অফিসার ও অধ্যাপক, 'ইণ্ডিয়ান ম্যাসেঞ্জার' পত্রের প্রাক্তন সম্পাদক, ডক্টর যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আমার সঙ্গে প্রায়ই গল্পসল্প করতে আসেন। সাধারণ্যে পরিচিত প্রচলিত ব্রাহ্ম সংকীর্ণতা থেকে তিনি মুক্ত, তুলনায় উদার, সহৃদয়, আলাপচারী। কিন্তু তৎসত্ত্বে কখনও কখনও উদারতার বিধি লঙ্ঘন করে গোষ্ঠীগত চেতনা আত্মপ্রকাশ করলে আমার ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ ঘটে। একদিন কি প্রসঙ্গে যেন তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করছিলেন; স্বভাবতই তাতে হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মধর্ম, রামকৃষ্ণ মিশন ও ব্রাহ্ম সমাজের তুলনামূলক বিচার মুখ্য স্থান অধিকার করে। তাঁর প্রত্যাশিত বক্তব্যের সারধর্ম ছিল, হিন্দু ধর্মভাবনার যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা একমাত্র

ব্রাহ্ম ধর্মচিন্তায়ই রক্ষিত আছে, এবং ব্রাহ্ম সমাজই একেশ্বরবাদের পক্ষে এবং অযৌক্তিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে, বর্তমান অবক্ষয় সত্ত্বেও, প্রগতির সম্ভাবনা উন্মুক্ত রেখেছে। বক্তব্য সম্প্রসারিত করতে করতে অকস্মাৎ তিনি বলে বসেন, আরে, এসব ধর্মকথা আমি কাকে বলছি, আপনার তো কোন ধর্মই নেই।

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে জবাব দিলাম, সেইজন্যই তো আমি ধার্মিক হতে পারলাম ; অথচ ধর্ম থাকা সত্ত্বেও অনেকেই ধার্মিক হতে পারে না।

এমনি একটা তির্যক উত্তর স্বভাবতই তিনি প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর চোখেমুখে বিস্ময়ের রেখা। সুতরাং আমাকে আরও সংযোজন করতে হলো, আপনি ঠিকই বলেছেন ড. চৌধুরী, আমার কোন ধর্ম নেই। আমি কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অন্তর্গত নই, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন ; সুতরাং, পরলোক, স্বর্গ, মোক্ষলাভ, ইত্যাদি বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও শিরঃপীড়া নেই। তবু, আমি নিজেকে ধার্মিক বলি ; কারণ, আমি কতগুলো আদর্শে স্থিত আছি, এবং সেই আদর্শের আলোকে জীবনকে উপলব্ধি ও সুগঠিত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছি।

আমাদের কাল মানুষের সম্মুখে নতুন নতুন আদর্শ এবং মানব অভিব্যাক্তির নতুন নতুন লক্ষ্য উপস্থাপন করছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো সত্য, ন্যায় ও শ্রেয়সের বোধে উদ্দীপ্ত হওয়া। ম্যাক্সিম গোর্কির নাটক 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্‌'-এ একটি আশ্চর্য ঘোষণা পাঠ করেছিলাম। উক্তিটি একজন স্ব-ঘোষিত খুনী সাটিনের—'মিথ্যা! সে তো ক্রীতদাসদের আর ক্রীতদাসদের প্রভুদের ধর্ম। সত্য হলো মুক্ত মানুষের ধর্ম।' এই উক্তি মনের দিক থেকে, বোধের দিক থেকে, আমাকে উন্নীত করে। কিন্তু সত্যে স্থিত এবং সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় না, এমন মানুষের সংখ্যা কত? আমি কিন্তু দাঁড়াতে চাই, মুক্ত মানুষ হিসেবে নিরন্তর রূপান্তরিত হতে থাকা আমার লক্ষ্য।

তাছাড়া, অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ধার্মিক মানুষ বলতে তো

আমরা কতকগুলো সদ্‌গুণের সমষ্টি বুঝি—সদাচারী, সদালাপী, নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, শ্রেয়সের ভাবনায় নিমগ্ন, ইত্যাদি। যার আচরণে কর্মে চিন্তায় এসব গুণের অভিপ্রকাশ, সে নিঃসন্দেহে ধার্মিক। অবশ্য একান্ত পার্থিব অর্থে। ড. চৌধুরী সম্মতি জানালেন। এই একান্ত জাগতিক সম্পর্ক বিধৃত ধর্মবোধ ঈশ্বর-ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ বি-যুক্ত। এই সংজ্ঞা অনুসরণ করে ধার্মিক হওয়ার জন্য ঈশ্বর, পরলোক, মোক্ষ ইত্যাদি অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্য প্রত্যয়গুলোর কোন উপযোগিতা আছে কি? বিন্দুমাত্রও নেই, এর ইঙ্গিত তো গৌতম বুদ্ধের চিন্তায়ই বিদ্যমান। ব্যবহারিক জীবন প্রাঙ্গণে এই সংজ্ঞা দ্বারা চিহ্নিত হওয়ার লক্ষ্য আমার।

অথচ, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগোষ্ঠীগুলো তাদের নিজ নিজ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতার দাবিতে দেশ ও কালের ইতিহাসকে বিদ্বেষে রক্তপাতে কী কলঙ্কিতই না করে রেখেছে। সুদূর অতীতে বাংলার বাউল সাধকরা এক সময় দুঃখ করে গেয়েছিলেন,

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে।।

মন্দির ও মসজিদের সঙ্গে যদি গীর্জা ও গুরুদ্বার সংযুক্ত করি, তাহলে এই কলিটি তৎক্ষণাৎ সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে। মানবিক ঐক্য এবং মানুষকে তার সহজাত মনুষ্যত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা কিছুতেই এবং কখনও সাফল্যমণ্ডিত হবে না, যদি-না মানুষের উপর থেকে ঐসব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের প্রভাব বিদূরিত হয়। সেজন্য আরও প্রয়োজন ঈশ্বর-ভাবনা এবং এই ভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অন্যান্য ধারণার অবলুপ্তি। মানসিক মুক্তি অর্জনের এবং মুক্ত মানুষের আবির্ভাবের এই হলো সন্দেহাতীত পূর্ব-সর্ত।

সেইজন্য সুদৃঢ় এই বিশ্বাসে আমি স্থিত হয়েছি যে, কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতকেই—তা সে হিন্দু, ইসলাম, শিখ, খৃষ্টান, অথবা অন্য যে কোন

ধর্ম ও গোষ্ঠীই হোক না কেন—রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয় ; এবং যেসব ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি কার্যকর রয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত। ভারতবর্ষের ধনতান্ত্রিক সংবিধানের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি এইখানে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়নের কালে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সর্বজনীন করার এবং সমপর্যায়ভুক্ত ঐক্যবদ্ধ সহজ মানুষের আবির্ভাবের জন্য জমি কর্ষণ করার সুযোগ এসেছিল। সুযোগ এসেছিল ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত অনৈক্য সাংবিধানিক শক্তিতে দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার, সম-অধিকার ও সমস্বার্থের ভিত্তিতে। কিন্তু, শ্রেণীস্বার্থের গরজেই হোক অথবা দূর-দৃষ্টির অভাবের জন্যই হোক অথবা গোষ্ঠী স্বার্থকে তোষণ করার দুর্বলতার জন্যই হোক, সেই সুযোগ গ্রহণ করা হয় নি। ঐক্যের বদলে অনৈক্যকেই আইন করে প্রশ্রয় দেওয়া হলো। আজ এটা অত্যন্ত পরিষ্কার, সেই ব্যর্থতাই গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার শক্তি। এরই সুযোগে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে কী ভয়ংকর অরাজকতায় নিমজ্জিত করে দিয়েছে, দিয়ে চলেছে। আসলে, আদর্শের সঙ্গে আপস ও লুকোচুরি খেলার মারাত্মক পরিণতি আজকের ভারতবর্ষ মর্মে মর্মে অনুভব করছে।

এই ক্রমবর্ধিষ্ণু সঙ্কটের মোকাবিলায় মার্ক্সবাদী চিন্তা ও কার্যক্রম কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা ঈষৎ পর্যালোচনার দাবি রাখে। কারণ, বিপ্লবের স্বপ্ন ও মানুষ নিয়ে ভাবনা মার্ক্সবাদীদের।

আন্তোনিও গ্রামশচি একদা একটি নিবন্ধে মার্ক্সবাদী দলগুলোর আদর্শগত সংগ্রামের দুটো বিষয়ের প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রথমটি হলো, মার্ক্সবাদে সু-স্থিত একদল সংগ্রামী বুদ্ধি-জীবী সৃষ্টি করা এবং দ্বিতীয়টি, মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন জন-সমষ্টিকে নতুন ধ্যানধারণায় শিক্ষিত করে তোলা। তাঁর বয়ানটি ছিল এই প্রকার। মার্ক্সবাদকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মোকাবিলা করতে

হয়: অতিশয় উচ্চমার্গীয় আধুনিক মতবাদগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তার নিজস্ব মৌল সত্তাসম্পন্ন স্বাধীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করা এবং বৃহত্তর জনসমষ্টিকে, যাদের সাংস্কৃতিক মান মধ্যযুগীয় পর্যায়ে থেকে গেছে, শিক্ষিত করে তোলা। এই নতুন জীবনদর্শন অর্থাৎ মার্ক্স-বাদের মূলগত বৈশিষ্ট্যের দরুন এই দ্বিতীয় কাজটিতেই, গুণগত ও পরিমাণগতভাবে, এর সমুদয় শক্তি ব্যয়িত হয়।

অর্থাৎ, দ্বিতীয় কাজটি—জনসাধারণকে নতুন জীবন-দর্শনে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করে তোলা—তুলনায় অনেক কঠিন। গ্রামশচি অবশ্য এই কথাগুলো ইউরোপীয় পার্টিগুলো, বিশেষত ইতালীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যক্ত করেছিলেন, তথাপি পৃথিবীর সমস্ত দেশ সম্পর্কেই বোধ করি তা প্রয়োগ করা চলে। ভারতবর্ষের মত একটি গুহ্য তন্ত্রমন্ত্র, গুরুবাদ, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, বর্ণপ্রথার অমানবিক শাসনে পীড়নে বিপর্যস্ত দেশের মার্ক্সবাদী আন্দোলন সম্পর্কে তো বটেই। আজ, এই মুহূর্তের দেশজোড়া রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা স্মরণে রেখে যদি অতীতের দিকে তাকানো যায় তাহলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, ভারতবর্ষে মার্ক্সবাদ গ্রামশচি-কথিত দ্বিতীয় দায়িত্বটির মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে। অন্তত এখনও পর্যন্ত তার উল্লেখনীয় সাফল্যের কোন স্বাক্ষর চোখে পড়ছে না। সেই সাফল্য অর্জিত হয় নি বলেই প্রায় ষাট বছরের সাম্যবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, মার্ক্সবাদী দলগুলো বৃহত্তর জনসমষ্টিকে স্বমতে, নতুন ধ্যানধারণায়, পরিচালনা করতে পারছে না; এবং অন্যদিকে, বিষয়গত দিক থেকে বিপ্লবের সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লব সংগঠিত হচ্ছে না, হতে পারছে না। এ সিদ্ধান্ত তর্কাতীত।

আমাদের নিজেদের কথাই ধরা যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে যখন বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ভিত্তিতে পার্টি সংগঠনের কার্যক্রম গৃহীত হয়, তখন আদর্শগত এবং সাংগঠনিক উভয় দিক থেকেই গ্রামশচি-কথিত কার্যক্রম দু'টি স্মরণে ছিল এবং লক্ষ্য

হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। বুদ্ধিমার্গীয় ক্ষেত্রে তখন মাসিক সাহিত্যপত্র "ক্রান্তি" প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল, পশ্চিমবাংলায় প্রচলিত যেসব কেতাবী ধ্যানধারণা ও বুর্জোয়া অবক্ষয়বাদী সাহিত্যাদর্শ আসর জমিয়ে বসেছিল, মার্ক্সবাদী দৃষ্টিমার্গ থেকে একে আক্রমণ ও প্রতিহত করা। এ হলো একদিক। অপরদিকে, কোন কোন মার্ক্সবাদী মহলে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগের ফলে যে বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল, তার ভ্রান্তি-গুলোও যুক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে উন্মোচন করা। আশা করা গিয়েছিল, রক্ষণশীল এবং বামপন্থী বিচ্যুতির প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদকে তার সত্যতায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে ; আর "ক্রান্তি"-কে কেন্দ্র করে একদল কবি-ঔপন্যাসিক-বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটবে যাঁরা মতাদর্শের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী মননশীলতাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবেন।

নানা কারণে "ক্রান্তি" নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারে নি, পরে বন্ধই হয়ে যায়। কিন্তু, এর স্বল্পকালীন অস্তিত্বের দিনেও সে যে ঈষৎ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল, এবং বেশ কিছু সংখ্যক পাঠককে নতুন চিন্তার স্পর্শে সচকিত করতে পেরেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অর্থাৎ, যত সীমাবদ্ধভাবেই হোক না কেন, বুদ্ধিমার্গীয় ক্ষেত্রে গ্রামশচি-কথিত প্রথম দায়িত্বের কার্যক্রম সাহসিকতার সঙ্গেই গৃহীত হয়েছিল।

কিন্তু, আজ অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে, জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার দ্বিতীয় কাজটি তেমন নিষ্ঠা বা একাগ্রতায় গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। সম্ভব না হওয়ার নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। তার মধ্যে সর্বপ্রধান বোধ করি জনসাধারণের দৃষ্টিতে এই নতুন জীবনদর্শনের অচিন্তনীয় অভিনবত্ব। হাজার হাজার বছর ধরে যে অদৃষ্টবাদী জীবন-দর্শন এবং এর জনক সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো তাদের সব ধ্যান-ধারণা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, তাদের মুখ থেকে বাক্যহরণ করেছে, তা

থেকে সরিয়ে আনার কাজ অত্যন্ত দুরূহ। সেটা একটা ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ। সেই কাজ আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়ে, যাঁরা জনসাধারণকে নতুন চিন্তায় শিক্ষিত করে তুলবেন তাঁদের সঙ্গে যাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন তাঁদের শিক্ষাগত ও জীবনাচরণগত দূরত্ব। সেই দূরত্ব চলনেবলনে, রচনারীতিতে, ভাষার ব্যবহারে নতুন মতবাদকে জনগণের সম্মুখে তুলে ধরার অপটুতার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ সর্বভাবেই ব্যক্ত হয়েছে।

অপটুতা বলছি এ কারণে যে, নতুন ভাবাদর্শে দীক্ষিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী যে ভাষায় কথা বলেন, অথবা নিজ বক্তব্য প্রচার করেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা জনগণের বোধগম্য হয় না এবং হয় নি। আমার কথাটা রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির সহায়তায় একটু বিশ্লেষণ করছি। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, 'ইংরেজীতে শিক্ষিত নয় এমন কোন বাঙালী পাঠককে যদি আধুনিক বাংলা সাহিত্য পাঠ করতে বলা হয়, তাহলে সে এর রস কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না।' তার কারণ হলো, ইংরেজীতে কৃতবিদ্য লেখক যে ধরনের ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করেছে অথবা কোন শব্দ বা উক্তির ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্য যে-ভাবে গ্রহণ করবে, ইংরেজী জানে না এমন পাঠক তা কোনভাবেই করতে পারবে না। ফলে, তার রচনার সঙ্গে ঐ শ্রেণীর পাঠকের হৃদয়-সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। এই রচনার জগৎ তার অনুভবের বাইরে। তেমনি, মার্ক্সবাদী পরিভাষায় যে কর্মী কথা বলে, পুরানো ধ্যানধারণায় আশ্রিত শ্রোতা তার মর্ম কতটা গ্রহণ করে বা করতে পারে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দলীয় কর্মী তাঁর পরিশ্রমকে পণ্ডশ্রম মনে করে হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়েছেন।

প্রশ্ন উঠবে, তাহলে মার্ক্সবাদীর পক্ষে মার্ক্সবাদী পরিভাষায় প্রচার কি অনুচিত? এ ভাষায় কথা না বললে অন্য কীভাবে সে কথা বলতে পারে? তাহলে কি তার নিজেরই বিভ্রান্তি দেখা দেবে না? সবিনয়ে বলতে চাই, আমি তা বলতে চাইছি না, বা তার ইঙ্গিতও দিচ্ছি না।

আমি বলতে চাইছি, জনগণকে একটা ঐতিহ্য বা সংস্কারের আশ্রয় থেকে সরিয়ে এনে অন্য এক মূল্যবোধে দীক্ষিত করা কত সুকঠিন এবং ঐ সুকঠিন দায়িত্ব পালনের উপযোগী কৌশল আমরা অবলম্বন করতে পেরেছি কি না। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, পারি নি। গ্রামশচি তাঁর ইতালীয় মার্ক্সবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন, জনগণকে শিক্ষিত করার দায়িত্বের মোকাবিলা করতে গিয়ে মার্ক্সবাদ স্বয়ং একটা অন্ধ সংস্কারে পরিণত হয়।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুব ব্যাপক বিস্তৃত নয়; এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দীর্ঘকাল দূরাবস্থিত বলে আমাদের দেশেও ঐ ধরনের সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে কি না, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু মন্তব্য করা শোভন নয়। তবে যুক্তি দিয়ে এটা বুঝি যে, সাবেকী ঐতিহ্যের প্রতিরোধ এবং জনগণের মানসিক প্রতিরোধ ভাঙ্গার জন্য এমন ভাষার ব্যবহারই সমীচীন যা তাদের মনের কাছাকাছি। যেসব রূপক, রূপকথা, চিত্রকল্প ইত্যাদি লৌকিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম, অথবা যার মধ্য দিয়ে লোকমানসের চিন্তা, জীবনের বোধ, স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ব্যক্ত হয়, মার্ক্সবাদী জীবনদর্শনকে যদি তার মাধ্যমে গণমানসে উপস্থাপিত করা যেত বা যায় তা হলে পূর্বোক্ত প্রতিরোধ ভাঙ্গা বোধ করি সহজতর হয়। অবশ্য, এ ব্যাপারে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা—তা যেমন মার্ক্সবাদী লেখকদের পক্ষে তেমনি কর্মীদের পক্ষেও—করার খুবই প্রয়োজন অতীতে ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের মার্ক্সবাদী দলগুলোর সাংগঠনিক দিক থেকে বিস্তর চিন্তা এবং ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, অন্তত আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্বের কথা মনে রেখে। কিন্তু, এটা বোধ করি জোর দিয়েই বলা যায়, তেমন কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি। সবগুলো দলই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এবং এখনও চালায়। কিন্তু সেটা যে গভীর চিন্তা ও পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, তা কোনমতেই বলা যায় না।

সেজন্য, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য যেমন নগণ্য, তেমনি

গ্রামশচি-কথিত মার্কসবাদী অন্ধ সংস্কারও এ দেশে গড়ে ওঠে নি। আসল কথা, জনগণের জীবন থেকে মার্ক্সবাদ এবং মার্ক্সবাদসম্মত জীবনদর্শন এখনও বহুদূরে, বিচ্ছিন্ন। এ কথা আজ নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না যে, কোন বিশেষ কেন্দ্রে কোন একজন মার্ক্সবাদী নির্বাচনপ্রার্থী বিধানসভায় অথবা লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন বলেই সেই এলাকার জনসমষ্টি নতুন ভাবাদর্শে পূর্ণ দীক্ষিত হয়ে গেছে। হয় না; আর হয় না বলেই নির্বাচনের ফলাফলে যেমন ব্যতিক্রম ঘটে, তেমনি ঐ সব অঞ্চলে এমন সব ঘটনাও ঘটে যা নতুন জীবনদর্শনের কোন পরিচয় বহন করে না।

সাম্প্রতিককালের একটি জাতীয় সমস্যাকে অবলম্বন করে আমার বক্তব্য বিশ্লেষণ করা যাক। সমস্যাটি আর কিছুই নয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; যা সাঁইত্রিশ বছরের স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক লজ্জাকর অস্তিত্ব। জনসমষ্টির সাধারণ জীবনবোধ এবং সাংস্কৃতিক মান কী পর্যায়ে আছে এইসব কুৎসিত ঘটনাই তার প্রমাণ।

এই বিষয়টির আলোচনায় আমরা প্রায়শঃই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলি। বর্ণপ্রথা, জাতিভেদ ইত্যাদি কতকগুলো অমানবিক প্রত্যয়কে ভিত্তি করে হিন্দু সমাজ সংগঠনে যেভাবে মানুষে মানুষে অনৈক্য ও পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ সংহত করা হয়েছিল, তাতে মানুষকে মর্যাদা দান করা হয় নি। স্বধর্মাশ্রিত তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের যেখানে এই অবস্থা, সেখানে অন্যধর্মাশ্রিত মানুষের মর্যাদার বা স্বীকৃতির প্রশ্ন অবান্তর। এটা নিশ্চয়ই গোড়াকার কথা। কিন্তু, মনুষ্যত্বের এই অবমাননাকে মেনে নিয়েও গ্রামীণ সমাজ কোন-না কোন ভাবে সাম্প্রদায়িক প্রীতি রক্ষা করে চলছিল। কিন্তু, সংগঠনে বিদ্বেষ ও হানাহানির ছিদ্র যে ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শনি তো ছিদ্র না পেলে প্রবেশ করতে পারে না; সেই ছিদ্রপথেই সাম্রাজ্যবাদ-রূপ শনি গণজীবনে প্রবেশাধিকার লাভ করে, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত করে বিদ্বেষ ও হানাহানির আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেই শনির অনুপ্রবেশের ফলে সুস্থ, বলিষ্ঠ, ধর্মীয় কলুষমুক্ত জাতীয়তার

বোধ যেমন জাগ্রত হতে পারে নি, তেমনি সম্পূর্ণ একটি ভুল তত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আমাদের জন্য রেখে গেছে। আর, সেই ভ্রান্ত দ্বিজাতি-তত্ত্বের যুক্তি-পরম্পরাগত সিদ্ধান্ত—লোক-বিনিময়—বর্জিত হয়েছে বলেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার আগুনও সে নিভিয়ে যায় নি।

জনসমষ্টিকে যদি মার্ক্সবাদসম্মত জীবনদর্শনে দীক্ষিত করে তুলতে হয় তা হলে তাদের মন থেকে বর্ণবিদ্বেষ, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির কলুষ দূর করা রাজনৈতিক শিক্ষা-নীতির প্রথম শর্ত। এখন প্রশ্ন হলো, এর পথ কী এবং পথে অন্তরায়ই বা কী? সমস্ত মার্ক্সবাদী গোষ্ঠীই এ কথা স্বীকার করেন যে, সাম্প্রদায়িকতা অথবা প্রাদেশিকতার হানাহানি জীইয়ে রাখা কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত। তাঁরা আরও স্বীকার করেন যে, জমি, জীবিকা, চাকুরি, সামাজিক কর্তৃত্ব, ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে সামন্ততান্ত্রিক অথবা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ধনিক শ্রেণীর কর্তৃত্ব যদি নির্মূল করা যায়, এবং ন্যূনতম অর্থনৈতিক দাবি ও অধিকার যদি সুনিশ্চিত করা যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মানুষের সামাজিক সমতা সুনিশ্চিত করা যায়, তাহলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় যে, আধুনিক মতবাদের স্পর্শ-না-পাওয়া অনগ্রসর সমাজে সাধারণত মানুষ একক ব্যক্তিসত্তা হিসাবে জীবনধারণ করে না, সম্প্রদায়বদ্ধ অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ রূপে অস্তিত্বশীল থাকে। সেজন্য, কোন সমস্যাকেই সে আপন বিবেক বুদ্ধি বা উপলব্ধির আলোকে বিচার করে না; বিচার করে গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের মান অপমান বা স্বার্থের নিরিখে। ফলে, দু-চারজন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তির কলহ অচিরেই সম্প্রদায়গত কলহের রূপ ধারণ করে। ব্যক্তি তার সম্প্রদায়গত পরিচয়ের মাধ্যমে প্রতিকারের উপায় খোঁজে, এবং পরিণামে নিজের সম্প্রদায়কে এবং সমগ্রভাবে দেশকে বৃহত্তর ক্ষয়ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয়।

জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রশ্নটি সেজন্যই অত্যন্ত জরুরী।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে এর সুযোগ কীভাবে এসেছিল এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, এ প্রশ্নটি এবার যাচাই করা যাক। খুব ব্যাপক প্রেক্ষিত গ্রহণ না করে শুধু সেকুলারিজম বা ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শকে সম্মুখে রেখেই ঈষৎ পর্যালোচনা করা যাক। ধর্ম-নিরপেক্ষতার রাজনৈতিক তাৎপর্য কী, জীবনের কোন্ কোন্ অঙ্গকে তা স্পর্শ করবে তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ তর্কবিতর্ক করুন। তবে, এই আদর্শটি যে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মনোভঙ্গি পরিত্যাগ করে আধুনিক মুক্ত যুক্তিবাদী মনোভঙ্গিতে আশ্রয় গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ, তা সম্ভবত অনায়াসেই মেনে নেওয়া চলে। আর, এও অনায়াসেই আশা করা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকীকরণের আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি রাষ্ট্র তার অন্তর্গত সর্ব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকেই এই আদর্শে স্থিত হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। অন্য কথায় বলতে গেলে বলা যায়, একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যবহারিক জীবনের রীতিনীতি, সম্পত্তি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ইত্যাদি ব্যাপারে একই ধরনের সঙ্গতিপূর্ণ আইনকানুন প্রচলিত থাকবে। সম্প্রদায়গত ও সামাজিক সমতা আনয়নের এটা একটা অনিবার্য পদক্ষেপ এবং এর ভিত্তিতেই একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সঙ্গে সমমর্যাদায় মিলিত হবে।

তত্ত্বের ক্ষেত্রে এর যৌক্তিকতা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব খণ্ডিত হয়েছে। একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়—আমি মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা বলছি—তার ধর্মীয় অনুশাসন এবং সেই অনুশাসন দ্বারা ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দিককে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার বজায় রাখার দাবি করেছে, এবং সে দাবি মেনেও নেওয়া হয়েছে। ভাল কথা, কিন্তু এর গভীরতর তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করেছি কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। তা হলো, ভারতবর্ষের জনসমষ্টির একটি বৃহৎ অংশ মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে, আধুনিকতাকে প্রতিরোধ করছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে

সম্প্রদায়গত ও সামাজিক সমতার সম্ভাবনাকেও বিনষ্ট করছে। শুধু তাই নয়, আধুনিকতাবিরোধী এই মনোভঙ্গি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, এমন কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার রূপে তা পুরস্কৃতও হচ্ছে। শুধু যে কংগ্রেসী অথবা সমমনোভাবাপন্ন নেতৃবৃন্দ এবং সরকার এটা মেনে নিয়েছেন তা নয়, বিভিন্ন মার্ক্সবাদী দলও সংখ্যালঘুদের তথাকথিত বিশেষ অধিকারকে মান্যতা দান করছে।

তা থেকে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বেশ কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সংখ্যালঘুত্বটা একটা কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়েছে, যেমন ক্ষেত্রবিশেষে তপশীলভুক্ত জাতি অথবা তপশীলভুক্ত উপজাতি হিসেবে বেঁচে থাকা কারও কারও কায়েমী স্বার্থের অনুকূল। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সমস্ত মানুষই সংখ্যালঘুত্বকে কায়েমী স্বার্থ রূপে ব্যবহার করতে পারে না; করে যারা তারাই সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের মাথায়, অথবা যারা অর্থের বা সামাজিক মর্যাদার কৌলীন্য ভোগ করে আসছে। তারাই আধুনিকতার বিরোধী, এবং তারাই জনসাধারণের অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে নিজস্ব স্বার্থকে সম্প্রদায়গত স্বার্থ রূপে প্রচারিত এবং প্রয়োজন-বোধে, গণমানসকে প্ররোচিত করে। এরই সমান্তরাল প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যেও সবিশেষ লক্ষণীয়। ঘাত-প্রতিঘাতের এই জটিলতা ও তত্ত্বগত প্রেক্ষিতের কথা বিস্মৃত হয়ে সংবাদপত্রের ভাষ্যকারগণ পরিবেশ বুঝে কখনও এই সম্প্রদায়কে কখনও ঐ সম্প্রদায়কে দোষারোপ করে সাম্প্রদায়িকতার চরিত্র উন্মোচন করছেন। কিন্তু, তাতে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর উহ্য থেকে যাচ্ছে। যেমন, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কি সার্বজনীন আদর্শ নয়? তা কি বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের জন্য, অন্যদের জন্য নয়? গণমানসকে সামগ্রিকভাবে আধুনিকীকরণের জন্য এর প্রয়োগ কি দেশকালে ব্যাপ্ত হওয়া উচিত নয়? মার্ক্সবাদসম্মত জীবনদর্শন বিকাশের জন্য এই আদর্শকে কি প্রাথমিক সোপান হিসাবে ব্যবহার করা যেত না বা যায় না?

আসলে, আদর্শ নিয়ে আপস বা আদর্শ থেকে বিচ্যুতি বা ব্যবহারিক প্রয়োগের বেলায় একে খর্ব করার পরিণতি কখনও কোন অবস্থাতেই ভাল হয় না। এই মনোভঙ্গি সংগ্রামকে যেমন দুর্বল করে, তেমনি ঐতিহাসিক কালের চ্যালেঞ্জ গ্রহণেও ব্যর্থ হয়। এর ফলশ্রুতি তো সুবিধাবাদ, যার মূর্ত প্রতীক আজকের প্রায় প্রতিটি মার্ক্সবাদী দল ও গোষ্ঠী। ইতিহাসের অমোঘ কার্যকারণ সম্পর্ক ও গতি এদের ঘাড় মটকে দিয়েছে, কালের আন্তর বেদনা অনুযায়ী সংগ্রামশীলতার বাতাবরণ সৃষ্টি আর তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এই সিদ্ধান্তের জের টেনে, এবং আত্ম-সমালোচনায় যদি আমরা বিমুখ না হই, তাহলে প্রত্যেকটি মার্ক্সবাদী দল বা গোষ্ঠীকে এই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে: অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সমস্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসের যে মার্ক্সীয় কাঠামো, তার সঙ্গে ধর্ম-সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সংখ্যালঘুত্বের প্রত্যয়ের সামঞ্জস্য কতটুকু? অথবা, উপস্থিত কোন প্রয়োজনে—যেমন নির্বাচনের সময় ভোটের আশা—সম্পূর্ণ অমার্ক্সীয় মনোভঙ্গি নিয়ে কোন এক ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি আনুকূল্য—যেমন কেরালায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা গঠন—সেই সম্প্রদায়কে তার কুসংস্কারের আশ্রয় থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার, সাম্প্রদায়িকতার বোধকে জয় করার, এবং সংস্কার-মুক্ত জাতীয় মনোভাবের বিকাশের সহায়ক হয় কি? এই প্রশ্নের উত্তর তো একটাই—সহায়ক হয় না, আর হয় না বলেই জনসমষ্টিকে নতুন জীবনদর্শনে দীক্ষিত করার কাজে মার্ক্সবাদী দলগুলো তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারছে না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি মন্তব্য অপরিহার্য। কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যদি তার মধ্যযুগীয় চিন্তার আশ্রয় ত্যাগ না করতে চায় এবং আধুনিকতাকে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করতে চায়, এবং আমরা যদি পরোক্ষভাবে তাতে ইন্ধন যোগাই, তাহলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শ্রম-জীবী জনসাধারণের শ্রেণীসংগ্রাম কি দুর্বল এবং বিঘ্নিত হয় না? আর, শ্রেণীসংগ্রাম যদি শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে তাহলে আমাদেরই

অপটুতার দরুন ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা কি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে না? এই প্রশ্নগুলো আজ অতিশয় গুরুত্ব অর্জন করেছে দুটি কারণে। প্রথমত, সাম্প্রদায়িক রক্তারক্তি এমন এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে, কোনরূপ প্রেক্ষিতহীন মিষ্ট কথার প্রলেপ তার মূলোৎপাটন করতে পারবে না; দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তঃসারহীন অস্থিরতা, যা আদর্শহীন দলত্যাগকে একটা রাজনৈতিক মতাদর্শের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। [বর্তমানে অবশ্য আইন করে তা বন্ধ করা হয়েছে।] এই পরিবেশকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য গ্রামশচি-কথিত গণ-শিক্ষার কী দুর্বার প্রয়োজনীয়তা যে আমাদের দেশে ছিল তা গভীর মর্মবেদনায় প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করি। আর অনুভব করি, তত্ত্বের ভাষা এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগের ভাষা, মুখের ভাষা আর কাজের ভাষা, বাণী এবং জীবন, যদি একই সূত্রে গাঁথা না থাকে, তাহলে কোন তত্ত্বই তার শক্তি ও বীর্যবত্তার পরিচয় দিতে পারে না।

শ্রেণীসংগ্রামের কথাই যখন উঠল তখন ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কথাও একটু ভাবা যাক। শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র যদি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করতে হয় তো কোন একটা সময়ে তাদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হবেই হবে। তবে, কখন কীভাবে সেই সংগ্রামকে রাজনৈতিক বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত করতে হবে তা নির্ভর করবে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক রাষ্ট্রিক পরিবেশের উপর। কিন্তু যেটা স্বতঃসিদ্ধ, এবং যা নিয়ে কোনরূপ দ্বিমতের অবকাশ নেই তা হলো, শ্রেণীসংগ্রামের সফলতার জন্যই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে একটা বিশেষ মুহূর্তে বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ দান করতে হবে।

একথা মনে রেখে যদি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দিকে তাকাই তাহলে এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয় যে, সেই আন্দোলন এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করে

নি। পথঘাটের অমার্জিত ভাষায় যাকে "কিছু পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি" বলা হয়ে থাকে, সংঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সেই কিছু পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি বা পচা ইকনমিজমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে এবং উপস্থিত চাওয়া-পাওয়ার বাইরে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, বিপ্লব তো দুঃস্বপ্ন। এই যে রাজনৈতিক সচেতনতা-বর্জিত কিছু পাইয়ে দেওয়ার আন্দোলন, তার অন্তর্নিহিত মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে মনে হয়—বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থা বা উৎপাদন সম্পর্ককে যেন অমোঘ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, যেন এই ব্যবস্থাটাই সর্বকালীন, চিরন্তন। সুতরাং এর মূলোৎপাটন আশু কর্তব্যের মধ্যে নেই। বরং, একে অপরিবর্তিত, অক্ষত রেখে ধনিক শ্রেণী যে লুণ্ঠনের জাল বিস্তার করেছে তা থেকে কিছুটা ভাগ ছিনিয়ে নেওয়াই সংঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। পচা ইকনমিজম সেজন্যই বেতনবৃদ্ধি, মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি বা বোনাসের দাবির সীমানা পার হতে জানে না, শেখেনি। সেজন্য, যে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র থেকে উত্তরোত্তর তীব্রতর করে বিপ্লবের জমি কর্ষণের কথা আমরা তত্ত্বগত অর্থে মানি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তা আদৌ প্রতিফলিত হয়েছে কি না বোঝা কঠিন।

অথচ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দানের প্রেক্ষিতে এই আন্দোলনকে অন্য দিগন্তের পথ ধরিয়ে দেওয়া যেত বলে আমার বিশ্বাস। প্রসঙ্গত মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির আন্দোলনের অপর দিকটা বিচার করা যাক। সকলেই জানেন, কোন একটি বৎসরের দ্রব্যমূল্যকে সূচক হিসাবে ধরে তার আনুপাতিক মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির দাবি উচ্চারিত হয়। এই দাবিকে উলটিয়ে দিয়ে যদি বলা হয়, আমরা মহার্ঘ ভাতা বা ভাতা বৃদ্ধি চাই না, কিন্তু দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা হোক এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি এই চ্যালেঞ্জও ধনিকশ্রেণীর প্রতি উচ্চারিত হত যে তাতে ব্যর্থ হলে সংঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ইকনমিজমের পথ ছেড়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ ধরবে, তাহলে এই কাঠামোকে বোধ

করি প্রচণ্ড একটা ধাক্কা এবং ধাক্কার পথে বিধ্বস্ত করা যেত। জানি, এর সঙ্গে নানাবিধ প্রশ্ন জড়িত। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক শিক্ষা, সংগঠন ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের জটিলতার কথা মনে রেখেও আমি এই প্রত্যয়ে স্থিত যে, কিছু পাইয়ে দেওয়ার আন্দোলনকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ না ধরিয়ে দিতে পারাটা বামপন্থী আন্দোলনের সামগ্রিক ব্যর্থতা। আর, এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই প্রকটিত হচ্ছে চলতি অর্থনৈতিক কাঠামোকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মেনে নেওয়ার ট্রেড ইউনিয়নী প্রবণতা। তা আমার পূর্ব সিদ্ধান্তকেই আরও জোরদার করছে, গণমানসকে শিক্ষিত দীক্ষিত করার কাজ ভারতবর্ষে কী নিদারুণভাবে অবহেলিত হয়েছে। গ্রামশচি লিখেছিলেন, এই কাজে ইতালীয় মার্ক্সবাদীরা বিপুল ব্যয় করেছিলেন। আমরা তার কিছুই করতে পারি নি, এই কঠোর সত্য আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই।

॥ ৪ ॥

আত্মধিক্কারের এক আবেগ-অস্থির মুহূর্তে (১৯০৭) বিপিনচন্দ্র পাল সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সর্বগ্রাসী পরিণতি সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমাদের চরিত্র গড়ে উঠেছে বিদেশী টবে ; টবেও নয় অর্কিডে। আমাদের পৌরুষ বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ; আমাদের জাতির এবং আমাদের জীবনের বাস্তব অবস্থার মধ্যে যেমন এর শিকড় নেই, তেমনি আমাদের জাতির অতীত ইতিহাসের সঙ্গেও এ সম্পর্কহীন। ইত্যাদি।

এই আত্মসমালোচনা নিঃসন্দেহে অতিশয় প্রখর, কিন্তু যথার্থ। অবশ্য, সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গূঢ় বাণীই তো ছিল তাই। যারা ঐ শিক্ষার আশীর্বাদ গ্রহণ করেছে তারা আত্মপরিচয়ে হয়েছে দীন, মনেপ্রাণে প্রবাসী, এবং হীনমন্যতার বোধে সতত কুণ্ঠিত।

সেইজন্যই ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজ প্রভুদের দেওয়া গাল 'নেটিভ' শব্দটিকে সমাদর বলে গ্রহণ করেছে, এবং নিজের নাম, পদবী, জন্মস্থানের নাম, জেলার নাম, ইত্যাদি বিকৃত করে (কারণ, ইংরেজরা এসব নেটিভ শব্দ উচ্চারণ করতে পারত না) প্রভুদের কৃপালাভের চেষ্টা করেছে। আর সর্বদাই স্বজাতীয়ত্ব থেকে বিজাতীয়ত্বে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল থেকেছে। কারণ, স্কুল-কলেজে পঠনপাঠনের মাধ্যমে তারা কি নিশ্চিন্তরূপে এটা উপলব্ধি করেনি যে বাংলা ভাষা ও ভাষা-আশ্রয়ী সংস্কৃতি অপেক্ষা ইংরেজি ভাষা ও ভাষা-আশ্রিত সংস্কৃতি অনেক বেশি উন্নত এবং বিশ্বজনীন ?

উদয়াস্ত এরই প্রভাবাধীন থেকে আমাদের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ যেভাবে গঠিত হওয়ার কথা ঠিক সেভাবেই গঠিত হয়েছে। বিপিনচন্দ্রের বিবরণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক মৌল নীতিটি অবশ্য স্মরণে রাখা প্রয়োজন; সেটি হলো. প্রত্যেক সমাজই তার নিজস্ব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে আপন বিধিব্যবস্থা ও জীবনদর্শনের মহিমা কীর্তনের অনুকূল পরিবেশ ও সন্তান সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদও তাই করেছিল। আজ সাম্রাজ্যবাদ নেই, কিন্তু তার শিক্ষাব্যবস্থাটি প্রায় অটুট। তার ফলশ্রুতি নানাবিধ বৈপরীত্য, বিভ্রান্তি, স্ব-বিরোধ। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তিতে নতুন সমাজব্যবস্থা অস্তিত্বশীল না হওয়া পর্যন্ত রূপান্তরিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন কল্পনাতীত।

সেজন্য, স্বজাতীয়ত্ব থেকে বিজাতীয়ত্বে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা আজও অব্যাহত। আজও এমন লোকের অভাব নেই দেশে, বিশেষ করে, অধ্যাপক সমাজে, যারা ইংরেজি-আশ্রয়ে জীবনযাপন এবং জীবনদর্শনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে। আসলে সমস্যাটা হলো আত্মমর্যাদায় স্থিত হওয়া এবং সম্পূর্ণ নিরাসক্ত বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে জাগতিক সমস্যা তথা সাহিত্যের মূল্যায়ন। কোন কোন সময় ভাবি, ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যদি ফরাসী আধিপত্য স্থাপিত হতো, তাহলে সাহিত্যাকাশের যে নক্ষত্রমণ্ডলী বর্তমানে আমাদের মানস-

পরিমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে বিরাজ করছে তার কি হেরফের হতো না? তাহলে শেক্সপীয়রও কি সম মর্যাদায় ঔজ্জ্বল্যে বিরাজ করতেন! তাহলে সম্ভবত অন্য প্রেক্ষিত থেকে তাঁকে বিচার করার দীক্ষা লাভ করতাম আমরা।

কখনও স্বকীয়তা অথবা স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষাৎ পেলে মন তৎক্ষণাৎ পুলকিত হয়। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের কার্যক্রম গৃহীত হওয়ার পর একদিন আমরা ইংরেজির পাঠ্যক্রম নির্ধা-রণের জন্য মিলিত হয়েছিলাম। বিশেষজ্ঞ রূপে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বসেছিলেন আমার পাশের চেয়ারটিতে। শেক্সপীয়রের কোন কোন নাটক পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এ আলোচনা শুরু হলে তিনি আমার কানে কানে বললেন, অরবিন্দ, শেক্সপীয়র বাদ দেওয়া যায় না?

প্রশ্নটা শুনে বিপুল বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি পুনরায় বললেন, অবাক হচ্ছ? আমি তো মাত্র দুটো নাটক ছাড়া আর কোন নাটকের সঙ্গে আধুনিক মনের কোন সংযোগ আছে বলে মনে করি না। একটা হলো 'দ্য মার্চেণ্ট অব ভেনিস' আর দ্বিতীয়টি হলো 'ওথেলো'।

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি, কিন্তু উপস্থিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হওয়ায় তিনি এ ব্যাপারে আর কিছু সংযোজন করার অবকাশ পেলেন না। মনে হয়, দ্য মার্চেণ্ট অব ভেনিসে সাইলকের সংলাপে সামাজিক অবিচার এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে উচ্চারিত তেজো-দৃপ্ত প্রতিবাদ এবং ওথেলোর ভালোবাসার ঈর্ষা, দ্বিধা, প্রেম-ঘৃণার বৈপরীত্য—এর সঙ্গে আধুনিক মনের আত্মিক সাযুজ্য ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুভব করে থাকবেন। পরবর্তী কালে আমার মনে হয়েছে, ঐ বিদ্যুতের মত ঝিলিক দেওয়া উক্তিটি যেন ঔপনিবেশিক ভাব-কাঠা-মোর নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতকে অস্বীকার করার এক সচেতন অথবা অসচেতন প্রয়াস। অসচেতন শব্দটি প্রয়োগ করছি এ কারণে যে, একটু বাদেই শেক্সপীয়রের সমকালীন নাট্যকারদের নাটক সম্পর্কে বিবেচনা শুরু হতে-

না-হতেই তিনি ডেকার-এর 'শু্যমেকার্স হলিডে' নাটক থেকে অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন। তাতেই ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে,—যে বুদ্ধিজীবীরা গুণাগুণ বিচার না করে ইংরেজদের রচিত রচনাকে মহৎ বিবেচনায় মুখস্থ করত, এবং সুযোগ পেলেই তাদের পারদর্শিতা আবৃত্তি করে প্রমাণ করত।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ কিভাবে বৈষয়িক উচ্চাশার আকর্ষণে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েন, তাঁর নিজের জীবনেই তার সাক্ষ্য বিদ্যমান। সে ঘটনাটি ঘটে যখন তিনি মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীরূপে পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় নির্বাচিত হন। কক্ষচ্যুত বলছি এ কারণে যে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর পরিচয় ছিল অতি সীমিত, এবং তত্ত্বগত আদর্শ হিসেবে তিনি তাকে গ্রহণও করেন নি। সে পরিচয়ও নির্বাচনের অল্পকাল পরেই মিলল।

কি উপলক্ষে একদিন সকাল বেলা তাঁর বাসভবনে গিয়েছিলাম। ঢুকেই দেখলাম, তাঁর কয়েকজন নতুন রাজনৈতিক বন্ধু তাঁকে ঘিরে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন মার্ক্সবাদ সম্পর্কে রচিত তার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করছে। একটু বাদেই প্রবেশ করেন আশুতোষ কলেজের তৎকালীন বাংলার প্রধান অধ্যাপক বিভাস রায় চৌধুরী। অনুরাগীদের স্তুতিবাদ ঈষৎ স্তিমিত হলে বিভাসবাবু বললেন, স্যর, এটা আমাদের ভালো লাগে নি, আপনার মত লোক শেষ পর্যন্ত মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালেন! এটা মোটেই সমর্থন করা যায় না।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, কেন, কি হয়েছে তাতে। হোয়াই শুড আই ফাইট শাই অব মার্ক্সিজম্। মার্ক্সবাদের মধ্যে কি আছে যেটা আপত্তিকর। আমি তো ওদের প্রোগ্রাম দেখেছি, সবই যুক্তিপূর্ণ। শুধু একটি মাত্র দাবি আছে যেটা আপত্তিকর; সেটা হলো বিনা ক্ষতি-পূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ।

এই মন্তব্য শোনার পর ঐখানে বসে থাকা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে-

ছিল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাঁর বাড়ির বিপরীতে অবস্থিত সতীশদার (সরকার) ঘরে এসে আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম। সব শুনে সতীশদা মন্তব্য করলেন, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তো ওতে আপত্তি করবেনই, কারণ ওঁরা তো জোতদার।

ঘটনাটি সামান্য। তথাপি, এখানে এর উল্লেখ করলাম এ কারণে যে এ থেকে একটা সিদ্ধান্ত ও মানসবৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে, যাকে চরিত্র-সংকট বলে চিহ্নিত করা যায়। এই সংকট আদর্শ ও আচরণের বৈপরীত্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে ; তা বৈষয়িক স্বার্থচেতনা থেকে আদর্শের সঙ্গে আপস করা বা আদর্শ জলাঞ্জলি দেওয়া থেকেও দেখা দেয় ; আবার জৈবিক গরজে নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করার মনোভঙ্গি থেকেও উদ্ভূত হয়। কিন্তু, এই সংকটকে কখনও বিচ্ছিন্নভাবে, বা শুধুই এককভাবে বিচারবিশ্লেষণ করা যায় না, করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই সংকট সামগ্রিক সামাজিক-রাষ্ট্রিক সংকট অথবা অবক্ষয়ের একটা আত্যন্তিক অভিব্যক্তি মাত্র। এই সংকট দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে, এবং দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের লগ্নে তীব্রতর হয়। আর, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় স্থূল ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তি—টাকা কামাও, নইলে নোংরা খেয়ে মর (ডি-এইচ-লরেন্সের উক্তি, গেট্ মানি অর ঈট্ ডার্ট)—সঞ্চারিত হওয়ায় মূল্যবোধের অবক্ষয় অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। বস্তুত, গত পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাস সামাজিক-নৈতিক মূল্যবোধের ক্রম-অবলুপ্তির ইতিহাস।

অবক্ষয়ের এই সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ব্যক্তি-মানসকে স্পর্শ করবে না, এমনটা হতেই পারে না। করেছে, এবং করেছে বলেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থানে এর অভিপ্রকাশ দেখে আমরা বিস্মিত হই। এই চরিত্র-সংকট যে শুধু ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনেই প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়, এর প্রতিফলন আমরা দেখেছি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে, নীহাররঞ্জন রায়ের জীবনে। এবং আরও অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির

জীবনে। তাঁদের মত মানুষের নিকট শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুরাগী জনসাধারণের প্রত্যাশা অনেক। প্রত্যাশা—তাঁরা বৈষয়িক সিদ্ধিলাভের পথ বর্জন করে এবং প্রশাসনের দয়াদাক্ষিণ্যের প্রতীক্ষায় বা প্রত্যাশায় না থেকে আপন আপন চিন্তামনন আদর্শের ভুবনে থাকবেন স্বরাট, উন্নতমস্তক। কিন্তু, তাঁরা যখন কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েন তখনই আমাদের গভীর মর্মপীড়ার কারণ ঘটে।

এই চরিত্র-সংকটের অতিশয় লজ্জাজনক অভিপ্রকাশ দেখা গেছে ১৯৬২ সনে ভারত-চীন যুদ্ধের সময়। তখন যুদ্ধে ভারতীয় সেনা-বাহিনীর বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে ভারতে সাম্যবাদী চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আসন্ন—এই আশঙ্কায় আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় অকস্মাৎ স্বাধীন সাহিত্য সমাজ বা সংস্থা এরকম নামে একটি সংস্থা আত্মপ্রকাশ করেছিল। উদ্দেশ্য একটাই—সাম্যবাদ বিরোধিতা। সংস্থার ইস্তাহারে বিঘোষিত হয়েছিল, (তথাকথিত) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্পীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে সাম্যবাদী রাষ্ট্রে সে স্বাধীনতা নিষ্পেষিত হয়। সুতরাং, সাম্যবাদের বিজয়ে শিল্পীর স্বাধীন সত্তার বিপদ। এই যুক্তিতে সেদিন সাম্যবাদ-বিরোধী এক বিপন্ন বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়াস চলেছিল, এবং উক্ত পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল—তারা যেন আপন আপন স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঐ অভিযানের সামিল হন। রচনা প্রকাশের সূত্রে যারা ঐ পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্থিক সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন, তাদের মধ্যে সে সময়ে সাম্যবাদ-বিরোধিতার এক বিকৃত, বিজাতীয় আগ্রহ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। যারা ঐ আগ্রহে প্রমত্ত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সাম্যবাদী বলে চিহ্নিত বিশিষ্ট কবি-ঔপন্যাসিকও ছিলেন। আত্মবিক্রয়ে আগ্রহী ঐসব লেখকদের আচরণ থেকে তখন এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, আদর্শটা তাদের নিকট নিছক একটা মুখোস; যখন খুশী যেভাবে খুশী সেটাকে ব্যবহার করা চলে।

কয়েকজন বন্ধুর প্ররোচনায় আমি স্বাধীন সাহিত্য গোষ্ঠীর বক্তব্যের

প্রতিবাদ করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম, এবং স্বয়ং তা ঐ সংস্থার দপ্তরে দিয়ে এসেছিলাম। আমার মূল বক্তব্য ছিল, স্বধর্মে স্থিত কোন শিল্পীর স্বাধীনতা কোন রাষ্ট্রব্যবস্থাই হরণ করে না। স্বধর্ম বলতে অবশ্য যাচ্ছেতাই করার কাণ্ডজ্ঞানহীনতা বোঝায় না ; বোঝায়, মানুষের মূক ক্রন্দনগুলোকে বাঙ্ময় করে তোলার দায়িত্ববোধ। প্রসঙ্গত, তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রস্বীকৃত স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা ও বিশ্লেষণ ছিল। গণতন্ত্রের সীমা কিভাবে নির্ধারিত হয়, উদাহরণ সহ তা উল্লেখ করে জি. কে. চেস্টারটনের এই তির্যক মন্তব্যটির সহায়তায় গণতন্ত্র সম্পর্কে শেষ কথা উচ্চারণ করেছিলাম— গণতন্ত্রের তো গুণের অন্ত নেই, দোষ মাত্র একটাই—ওটা অ-গণতান্ত্রিক।

বলা বাহুল্য, স্বাধীন মতামতের উদ্‌গাতাগণ আমার প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন নি। দিন দশেক বাদে রচনাটি আমার নিকট ফিরে আসে, সঙ্গে সম্পাদকীয় দুঃখপ্রকাশের সৌজন্যমূলক চিরকূটও ছিল না। প্রবন্ধটি দু-চার দিন বাদে 'যুগান্তর'-এ এবং সাপ্তাহিক 'দর্পণ' এবং 'গণবার্তায়' ছাপা হয়। 'দর্পণ' একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে পত্রিকাগোষ্ঠীর আচরণের প্রবল নিন্দা এবং আমার বক্তব্যের প্রতি বিপুল সমর্থন জানিয়েছিল।

সাহিত্য-সংস্কৃতি জিজ্ঞাসার সমান্তরাল অন্য একটি কক্ষপথে আমাকে বিচরণ করতে হয়েছে ; সেটা শিক্ষকতার, বিশিষ্টার্থে অধ্যাপনার। আগেই লিখেছি, এই কক্ষপথে আবর্তন আমার কাঙ্ক্ষিত ছিল না। ফলে, পশ্চাতের অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে বলতে পারি না যে, আমার পথ-পরিক্রমা সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে। যে নিষ্ঠা, একাগ্রতা, অভিনিবেশ এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ছিল, অন্যমনস্ক মন তা দিতে পারে নি। সেজন্য, হোঁচট খেতে হয়েছে বারংবার ; কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি, ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, কিন্তু কি এক অনিবার্যতায়—সম্ভবত কাল-প্রবাহের নয়তো বা বহু ইচ্ছার অভিঘাতে সৃষ্ট আবর্তের—পুনরায়

এই কক্ষপথেই সংস্থাপিত হয়েছি। দেখেছি, ঐ অবক্ষয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক অবাঞ্ছিত বাতাবরণ সৃষ্টি করে রেখেছে; আর এর উৎসমুখ একটি নয়, বহু—ছাত্র, শিক্ষক, প্রশাসন সকলের অবদানই এখানে স্বীকৃত। সেই অবাঞ্ছিত পরিবেশে স্থিত থেকে নিজেকে পূর্বসুরীদের, বিশেষ করে আমার দু-চার জন শিক্ষকের সঙ্গে তুলনা না করে পারি নি। নিষ্ঠা এবং মনুষ্যত্ব, উভয় বিচারেই নিজেকে মনে হয়েছে দীন। সেই সব ব্যক্তিত্বের দু-একটি চিত্র এখানে তুলে ধরছি। যদি অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয় তো তা অবশ্যই মার্জনীয়।

১৯৫১ সনের গ্রীষ্মকালের একটি সকাল। পুরাতন মুদিয়ালী রোডের একটি বাড়িতে ভয়ে ভয়ে কড়া নাড়লাম। ভয়ে ভয়ে, কারণ যদিও স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে এসেছি তের-চোদ্দ বছর আগে, তথাপি প্রধান শিক্ষক চিন্তাহরণ মজুমদার সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ভয় তখনও লালন করে চলেছি। তিনি নিজেই খুললেন, এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, আরে, তুই? আয়, কতকাল তোকে দেখি না।

শুনে ঈষৎ অবাকই হলাম। কারণ, আমার সম্পর্কে সুখকর স্মৃতি তাঁর বিশেষ থাকার কথা নয়। বরং, রাজনীতির সঙ্গে আমার সংস্রব থাকায় তিনি মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত ছিলেন, দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমাকে দু-ঘা বেত মেরেছিলেন এবং স্কুল থেকে বিতাড়নের ভয় দেখিয়েছিলেন। তথাপি, আমার সম্পর্কেও কি একটুখানি মমতা কোথায়ও লুকিয়েছিল তাঁর হৃদয়ে!

একথা-সেকথা জিজ্ঞাসার পর বললেন, বল, কি খবর নিয়ে এসেছিস।

বললাম, সামান্য একটু সুখবর নিয়ে আপনাকে প্রণাম জানাতে এসেছি।

—কি রে?

—আমি ডক্টরেট হয়েছি।

—তুই ডক্টরেট হয়েছিস? বলেই চেয়ার থেকে উঠে আমাকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। বলতে থাকলেন, তুই ডক্টরেট হয়েছিস? তুই ডক্টরেট হয়েছিস? তোর থেকে অনেক ভালো ভালো ছাত্র আমি পড়িয়েছি। তারা অধ্যাপক হয়েছে, বড়ো বড়ো চাকুরে হয়েছে; তারা কেউ ডক্টরেট হয় নি। তুই ডক্টরেট হয়েছিস? আমার ছাত্রদের মধ্যে তুই-ই প্রথম ডক্টরেট।

আমার কাঁধে একটা উষ্ণ তরল পদার্থের স্পর্শ লাগায় তাকিয়ে দেখি তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরছে। আনন্দাশ্রু। আনন্দাশ্রু কি জিনিস আমার জানা ছিল না, সেই মুহূর্তে জানলাম। তা যে এমন নির্মল, পবিত্র হয় তাও ছিল আমার কল্পনার অতীত। তা প্রত্যক্ষ করলাম। ভাবাবেগ কিছুটা স্তিমিত হলে তিনি বললেন, আর আমি তোর জন্য কি করতে পারি বল? বলেই তাঁর ডান হাতটা রাখলেন আমার মাথায়, মন্ত্রবাক্য উচ্চারণ করলেন, তুমি আরও যশস্বী হও।

অনুভব করলাম, আমার দুচোখ জলে ভিজে উঠেছে। এবার বসলেন চেয়ারে। বলতে লাগলেন, তোকে বলতাম কি না বল, ঐ সব পলিটিক্স-ফলিটিক্স তুই ছাড়, ওসব করলে জীবনে উন্নতি হয় না। বলতাম কি না—

মন আমার তখন কলকাতা ছেড়ে ময়মনসিংহের কৈশোরে ফিরে গেছে। নানা ঘটনার উপর থেকে বিস্মৃতির আববণ উন্মীলিত হয়ে চলেছে। স্ফুট-অস্ফুট স্বরে অতীতের সঙ্গে আমার সংলাপ শুরু হয়েছে। অকস্মাৎ মনে পড়ল সেই কাহিনীর কথা, যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও সামগ্রিকভাবে স্কুলের জীবনে এক অচিন্তনীয় সংকটের সৃষ্টি করেছিল। অথচ, সেই সংকট তিনি পার হয়ে এসেছিলেন অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তায়, নির্বিশঙ্ক আত্মপ্রত্যয়ে, অবলীলায়—উন্নতমস্তক, নিষ্ঠুর পক্ষপাতহীন। আর স্থাপন করেছিলেন ব্যক্তিগত আচরণের এক সুদুর্লভ অবিস্মরণীয় আদর্শ।

সেটা সম্ভবত ১৯৩৬ সন। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠান

চলছে। স্কুল প্রাঙ্গণে বিপুল জনসমাবেশ—ছাত্র, অভিভাবকগণ, নাগরিকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিগণ। এসব অনুষ্ঠানে সাধারণত কিছু আবৃত্তি, দু-একটা গান, ইংরেজি ও বাংলায় দু-একটি নাট্যদৃশ্যের অভিনয়, ইত্যাদি পরিবেশিত হতো। অভিনয় চলছিল। অকস্মাৎ দেখা গেল, দোতলার বারান্দা থেকে কারা যেন কিছু প্রচারপত্র নিচের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ছন্দপতন। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, অবশিষ্ট কার্যক্রম বলতে গেলে পণ্ড। পাঠান্তে দেখা গেল, ঐ কাগজগুলো নিছক নিষ্পাপ আমোদের উপকরণ নয়, দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারপত্র। একটি নাট্যানুষ্ঠানের প্রচারপত্র যেভাবে রচিত হয়, অবিকল সেভাবে রচিত এই বিজ্ঞাপনে স্কুলের শিক্ষকদের নাম হয় অতিশয় বিকৃতভাবে নয়তো প্ররোচক বিশেষণসহ নির্দেশিত হয়েছে। ব্যাপারটা ঘনীভূত হলো পরদিন। সকলের মুখে মুখে এই কাহিনী—বিস্ময়, বিদ্রূপ, বিজাতীয় আনন্দ, নিন্দাবাদ। স্কুল কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই উদ্বিগ্ন, মনোভাবে কঠোর। কার এত বড় স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য !

পুলিশ লাগল। সহরের ছাপাখানাগুলোতে অনুসন্ধান চালিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাপাখানা আবিষ্কার করা গেল, আর সেই সূত্রে অপরাধী ছাত্রদেরও সনাক্ত করা গেল। পরম বিস্ময়ে সবাই জানল হেড মাস্টার মশাই-এর কনিষ্ঠ পুত্র ঐ উদ্ভট নাট্যরসের পয়লা নম্বর পাণ্ডা। সহযোগিতায় ছিল জনা তিনেক সতীর্থ। আসামী সনাক্তকরণের পর বিচারের পালা। সহযোগীরা নিজ নিজ অভিভাবকদের শাসনে ক্ষমা প্রার্থনা করল, ক্ষমা পেলও। কিন্তু হেড মাস্টার মশাই নিজের ছেলেকে দিলেন নির্দয়তম শাস্তি—তাকে স্কুল থেকে বিতাড়িত অর্থাৎ রাস্টিকেট করলেন। পরিণামে গৃহত্যাগী হলো সে। চরিত্র ও সংকল্পের কী দার্ঢ্য, ব্যক্তিত্বের কী ঐশ্বর্যের অধিকারী হলে একজন শিক্ষকের পক্ষে নিজের ছেলেকে—তার অসদাচরণের গুরুত্ব যাই হোক—স্কুল থেকে বিতাড়ন করা সম্ভবপর হয়, তা আমার মানসিক শক্তির, উপলব্ধির, কল্পনার, অগোচর। সেই থেকে চিন্তাহরণ মজুমদার ময়মনসিংহে কিংবদন্তীর নাম।

পাঁচ বছর পরের কথা। ইউনেস্‌কোর উদ্যোগে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার-এ দু-দিনের একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল (২৬-২৭ মে, ১৯৫৬)। বিষয়বস্তু ছিল—ইম্‌প্যাক্ট অব ইনডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন অন ট্র্যাডিশান্যাল আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রেফট্‌স্ অব বেঙ্গল ইন অ্যাণ্ড এরাউণ্ড ক্যালকাটা। সেই সভায় একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত। বলা বাহুল্য, সম্মত হয়েছিলাম। আমার বক্তৃতা ছিল শেষের দিন। বক্তৃতামঞ্চে উঠেই দেখি, হেডমাস্টার মশাই একেবারে প্রথম সারিতে বসে আছেন লাঠি ভর দিয়ে; বয়সের ভারে দেহ আরও অধিক শীর্ণ, ন্যুব্জ। যুগপৎ ভয় ও আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। বাসনা ছিল, সভা শেষে তাঁকে প্রণাম করব, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মেটাতে বিলম্ব ঘটায় তাঁকে খুঁজে পেলাম না।

হেড মাস্টার মশাই-এর সঙ্গে ঐ সাক্ষাৎকারের সময় আমার পশ্চাতে ছিল বৎসরাধিক কালের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা। আত্ম-মূল্যায়নের পক্ষে এইটুকু মাত্র সময় নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়। তবু, নিজেকে এই প্রশ্ন না-করে পারলাম না, শিক্ষক হিসেবে কি অর্জন করেছি আমি, কি আমার সঞ্চয়? দেখলাম, সঞ্চয়ের কোঠায় সামান্য একটু পুরস্কার—হরগঙ্গা কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্রের মূল্যায়ন।

সে এসেছিল বার্ষিক পরীক্ষার ফল জানতে। আমি বলব না কিছুতেই। ওর মনোযোগ বিষয়ান্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কলেজের নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম; উঠল অধ্যক্ষের কথা। উঠতেই ওর কপাল কুঞ্চিত হলো লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলাম, ওঁকে তোমরা ভয় কর না? ও জানাল, কেউ ভয় করে না, পাত্তাই দেয় না। আমার প্রশ্ন, তোমরা কি কাউকেই ভয় কর না?

—হ্যাঁ, স্যর, করি; আপনাকে।

—আমাকে? বল কি? আমি তোমাদের সঙ্গে কত হাসি তামাসা রসিকতা করি, আমাকে কিসের ভয়?

—তবু, স্যর, আপনাকেই ভয়। আপনি যে ক্রিটিক, আপনি যে সব দেখেন।

ছেলেটির এই মন্তব্য নিয়ে আমি অনেক সময় ভেবেছি, এখনও ভাবি। যে সময়ের কথা, তখন আমার কোন বই বের হয় নি; 'ক্রান্তি'-তে দু-তিনটে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে তো ওর জানার কথা নয়, পড়বার তো নয়ই। তবু, কিসের ভিত্তিতে ওদের এই সিদ্ধান্ত যে আমি ক্রিটিক, আমি সব দেখি! যাই হোক, এই উক্তিটিকে আমি আমার প্রথম পর্বের কলেজীয় অভিজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ গণ্য করে আসছি।

প্রসঙ্গত, কিশোর বয়সের গালমন্দের ছলে পাওয়া একটি পুরস্কারের ঘটনা মনে পড়ছে। সম্ভবত তখন নবম শ্রেণীতে পড়ি। একদিন মাস্টার মশাই—অর্থাৎ মহেন্দ্রবাবু—আমাকে গালমন্দ করছিলেন লেখা-পড়ায় অমনোযোগিতার দরুন। গালমন্দ করতে করতে হঠাৎ বলে বসলেন, 'তোর চেহারা পর্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কী ব্রাইট ছিল তোর চাহনি!' যেই না বলা অমনি সামনে পেছনে পাশাপাশি অনেক জোড়া চোখ আমাকে যেন বিদ্ধ করে ফেলল। মাস্টার মশাই আমার চোখে কি ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করে আসছিলেন জানি না। তবে, আত্ম-প্রীতিতে কিছুটা মগ্ন হয়ে ভাবতে ভালো লাগে, পরবর্তীকালে সমালোচক রূপে গড়ে ওঠার পূর্বাভাস কি মাস্টার মশাই আমার চোখে লক্ষ্য করেছিলেন?

কলেজীয় বৃত্তের মধ্যাহ্নে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি পুরস্কার লাভ করেছিলাম বেলুড় বিদ্যামন্দিরের তৎকালীন অধ্যক্ষের কাছ থেকে। সে কলেজে চাকুরিতে প্রবেশ-লগ্নে যেমন ছিল নাটকীয় সংঘাত, বিদায় লগ্নে তেমনি আনন্দমগ্ন স্মৃতি। আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার পূর্বে স্বামীজি মহারাজরা আমার, 'উনবিংশ শতাব্দীর পথিক' গ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ' প্রবন্ধটি পাঠ করে নিয়েছিলেন। সাক্ষাৎ-কারের জন্য ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই অধ্যক্ষ তেজসানন্দ মহারাজ আমাকে

আক্রমণ করলেন এই বলে যে আমি স্বামী বিবেকানন্দের বিকৃত মূল্যায়ন করেছি। মনে মনে ভাবলাম, চাকুরি তো আর হবেই না, সুতরাং বিতর্কে পিছ-পা হই কেন? শুরু হলো তর্ক, চলল প্রায় পঞ্চাশ মিনিট ধরে। আমার বক্তব্যের সারাৎসার ছিল, শুধু অধ্যাত্ম পরিচয় পুনরাবিষ্কার এবং বিশ্বজুড়ে তা প্রসারিত করা,—এটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একমাত্র দাবি ছিল না; এর অন্যতম প্রধান দাবি ছিল, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন। অথচ, বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে তাঁর চিন্তা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট; এমন কি, এক সময়ে বিবেকানন্দ রাজনীতিকে 'হোয়াট ননসেন্স' বলে ঘৃণাও প্রকাশ করেছিলেন।

ওঁরা নানান বিস্ফোরক শব্দ ব্যবহার করে আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তেজসানন্দ মহারাজ এক সময়ে বলেন, আপনি জানেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষ, জওহরলাল, ওঁরা কি চোখে স্বামীজিকে দেখতেন?

—না জানার কোন কারণ নেই; আমার বাল্যকালেও স্বামী বিবেকানন্দের ফটো থাকত পড়ার টেবিলে।

—আপনি কি জানেন, কত হাজার হাজার যুবক স্বামীজির আহ্বানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে দেশসেবার জন্য?

—খুব জানি; কিন্তু তাদের বেশির ভাগই রাজনীতি তথা বৈপ্লবিক কর্মে আত্মোৎসর্গ করেছে। খুব অল্প সংখ্যক এসেছে মিশনে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মিশনের সত্যই কি কোন ভূমিকা ছিল?

—বলেন কি?

—ঠিকই বলছি; তাঁর আহ্বানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সাড়া দিয়েছে। কিন্তু যখন দেখা গেল, অধ্যাত্ম শক্তির জোরে বিশ্ব বিজয়ের সংকল্প দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজকে তাড়ানো যাবে না, তখনই তারা অন্য পথ ধরল। এইখানেই তাঁর চিন্তার বিরাট এক ত্রুটি এবং ফাঁক।

—আপনার এই মন্তব্যও বিভ্রান্ত এবং একপেশে।

—আমি মানি না। কারণ, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে

সমগ্র ঐতিহাসিক পটভূমিটি আমি উপস্থাপন করি এবং ধীরে ধীরে বিশ্লেষণের পথ ধরে অগ্রসর হই। যুক্তি ও তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয় এমন বিশ্লেষণ আমি করি না, স্বামীজির ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই করি নি। তাছাড়া, পরবর্তীকালে ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর চিন্তার ত্রুটি যদি ধরা পড়ে তবে তা বলব না, এমন ব্যক্তিত্বের বিকাশই কি বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ?

আলোচনার উপান্তে এসে তেজসানন্দ মহারাজ স্বীকার করলেন, আপনার বিশ্লেষণ চমৎকার, আমি অতিশয় মুগ্ধ হয়েছি। তবে, আপনি আমাদের সম্পর্কে এমন বিশেষণ ব্যবহার করেছেন যে সেগুলো আমাদের গায়ে ভীষণ লাগে।

বিজয়ের উদ্দীপ্ত হাসি ফুটল আমার মুখে। আলোচনার সমাপ্তি টানলেন স্বামী বিমুক্তানন্দ ; বললেন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সঙ্গে না-ই বা মিলল, আপনার মত স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত মানুষই আমরা চাই।

সাক্ষাৎকারের পরদিনই চাকুরির নিয়োগপত্র আমার হাতে পৌঁছে গিয়েছিল।

তিন বছর কয়েক দিন বাদে ছেড়ে-আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে তেজসানন্দ মহারাজের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ করলাম, তিনি বললেন,—আপনাকে তো ধরে রাখতে পারব না। এতদিন থাকবেন আমরা তাও ভাবি নি। আপনি চলে যাবেন এ যেমন সত্য, আপনার জায়গায় অন্য অধ্যাপক আসবেন তাও তেমনি সত্য। তবে কি জানেন, অরবিন্দবাবু, আজকাল ভদ্রলোক তেমন পাওয়া যায় না।

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের এই দুটি উক্তিকে আমি আমার পুরস্কার স্বরূপ মান্যতা দান করে আসছি, এখনও করি। শিক্ষক রূপে আমার সীমিত সার্থকতার কিছু পরিচয় হয়তো এতে নিহিত। কিন্তু হেড মাস্টার মশাইকে প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে যখন আপন শিক্ষকসত্তার আত্মজিজ্ঞাসায় নিমগ্ন হই তখন মনে হয়, কি অর্জন করেছি আমি অথবা জেনেছি

সফলতা, চিত্তের ঔদার্য অথবা বুদ্ধিমার্গীয় সাধনা দ্বারা, যা তাঁর মনুষ্যত্বের সঙ্গে একই নিশ্বাসে উচ্চারিত হতে পারে? আমার সম্বল তো কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থ, আর সামান্য কিছু পরিচয়। কিন্তু সেই আদর্শনিষ্ঠা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা কি আমার আছে যার সহায়তায় তিনি তাঁর ছেলেকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করতে পেরেছিলেন? আর, কোথায়ই বা পাব আমি সেই হিরণ্ময় হৃদয়, যে হৃদয় ছাত্রের কৃতিত্বে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে, গুণীজন সমাবেশে ছাত্রের স্বীকৃতিলাভ প্রত্যক্ষ করার জন্য অশক্ত দেহ নিয়েও উপস্থিত হয়? না, সে হৃদয় আমার নেই, কোনদিন ছিল না, কোনদিন হবেও না। আমার কাল ক্ষয় হতে হতে সে হৃদয়কে হত্যা করেছে, আর আমার জন্যে সঞ্চিত রেখে গেছে শুধুই অবক্ষয়ের জঞ্জাল।

ডাক্তার বাড়ি আছ? ডাক্তার বাড়ি আছ?

রাণীগঞ্জে অবস্থান কালে একদিন বিকেলে এই অদ্ভুত ডাক শুনে চমকে উঠলাম। এই বিচিত্র সম্বোধনে কেউ-তো আমাকে ডাকে না। সমবয়সী বন্ধুরা ডাকেন নাম ধরে, একটু দূরবর্তী যারা তারা নামের সঙ্গে বাবু অথবা প্রারম্ভে ডক্টর খেতাবটি জুড়ে দেয়, আর সর্বাধিক পরিচিত ডাক 'স্যর'। কিন্তু ডাক্তার বাড়ি আছ? বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দরজা খুলেই আশ্চর্য হলাম, স্যর, আপনি?

—হ্যাঁ, এলাম তোর সঙ্গে আড্ডা দিতে। ভেতরের দিকে তাকিয়ে বললেন, বৌমা, আমি কিন্তু দু'একদিন থাকবো।

স্যর মানে আমার মাস্টার মশাই, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, নীহাররঞ্জন রায়ের পিতা। সে সময়টায় আসানসোলে অবস্থান করছিলেন; হঠাৎ কি খেয়ালে বাসে চেপে রাণীগঞ্জে এসে উপস্থিত, খোঁজাখুঁজি করতে করতে আমার বাসভবনে। বার দু-তিন আমাদের বাড়ি এসে থেকেছেন। যে কদিন থাকতেন সত্যি আড্ডাই দিতেন। ব্যক্তিত্বের কি ঔদার্যে, এবং নির্বাধ, মুক্ত মানসিকতার কি আশ্চর্য বিস্তারে তিনি তাঁর সঙ্গে আমার প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন,

তা ভেবে এখনও বিস্ময়বোধ করি। অবশ্য মন তাঁর চিরকালেরই মুক্ত, বিশ্ববিহারী। ছাত্র থেকে আমার উত্তরণ ঘটেছিল বন্ধুতে। এই রূপান্তরে বিন্দুমাত্র কৃতিত্বও আমার নেই, সবই তাঁরই ব্যক্তিত্বের প্রসন্ন আত্মোপলব্ধি। মানবিক ভুবনে সুবিস্তৃত যাবতীয় বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর মানসজগতের ব্যাপ্তি যেমন প্রতিভাত হতো, তেমনি তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি আপন স্মৃতিকে আস্বাদন করতে পারার এক উচ্ছ্বসিত অনাবিল আনন্দ।

স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল ; কিন্তু ঐ গুণটিই কোন কোন সময় মনোমালিন্যের হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি এমন এক ব্যক্তি-সত্তার প্রকাশ যা আপন কর্মের দায়িত্ব স্বীকারে কখনও কুণ্ঠিত হয় না, যা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায় নির্ভয়ে। অর্থাৎ, যে মন মুক্ত। তাঁর নিকট কপটাচার, বিশেষ করে নৈতিক কপটাচার, ছিল দুঃসহ। একদিনের আড্ডায় তারই উদাহরণ দিলেন নিম্নোক্ত কাহিনীটি বিস্তার করে।

কোন এক ছুটিতে দুজন শিক্ষক বন্ধু সহ বারাণসী বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখন 'ডন সোসাইটি' খ্যাত সতীশ মুখোপাধ্যায় সেখানে বসবাস করছিলন, সন্ন্যাসাশ্রমে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং জাগতিক বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় তিন বন্ধু অতিশয় পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। সঙ্গী দুজন এত বিমুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরা তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প করেন। সাগ্রহে মাস্টার মশাইকেও দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব করলে তিনি এক রাত্রি সময় চেয়ে নেন আত্মজিজ্ঞাসার জন্য। পরদিন সকাল বেলা সতীশ মুখোপাধ্যায়ের নিকট যাওয়ার জন্যে তৈরী হতে হতে বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেন, মহেন্দ্রবাবু চলুন, যাবেন না ?

—না।

—সে কি ? এই তো সময়, এমন সদ্গুরু কি আর পাবেন। চলুন, চলুন।

—না, যাব না।

—কেন বলুন তো ?

—আমার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি।

ঘটনাটি বর্ণনা করে আমাকে বললেন, দেখ, ঐসব ভণ্ডামি আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আমার মধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণা কামনা ইত্যাদির পীড়ন পুরা মাত্রায় বজায় রয়েছে, অথচ বাইরে আমি মানুষকে দেখাব আমি জিতেন্দ্রিয়, আমি অধ্যাত্ম সাধনায় মগ্ন, এমন রকধার্মিক আমি সাজতে পারব না। আমি যা, আমি তা-ই। আমাকে যদি এভাবে তুমি গ্রহণ করতে পার তো এসো, না পারলে আমার দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই।

এই নিরাভরণ সততা আমাকে মুগ্ধ করে। কারণ, যে মানুষ কপটাচারের প্রতি বীতরাগ ও অসহিষ্ণু, সে তো আপন মনুষ্যত্বে স্থিত ; এবং স্থিত বলেই মাস্টার মশাই-এর জীবনে মিথ্যার আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হয় নি কখনও। শুদ্ধ এই গুণটির জন্য আমি তাঁর সঙ্গে মানসিক নৈকট্য অনুভব করেছি।

মাস্টার মশাই পড়াতেন বাংলা। কিন্তু তাঁর পঠনপাঠনের বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য ; পাঠ্য পুস্তকের সীমায় তিনি কখনও আলোচনা আবদ্ধ রাখতেন না। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মনকেও বাইরের পৃথিবীতে প্রসারিত হওয়ার, আকাশে উড়বার, সুযোগ করে দিতেন। আমার বক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, মাস্টার মশাই অনুসৃত পথই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ, মানসিক ঐশ্বর্যের দিকে ধাবিত হওয়ার পথ। কারণ, পাঠ্য পুস্তকের সীমায় আবদ্ধ মনের বিচরণ ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ ; ফলে, বৃহত্তর জাগতিক ও মানবিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি ও সামর্থ্য সে কোনদিনই অর্জন করে না। তাঁর সহজাত উপলব্ধি থেকে এ সত্য বিচ্ছুরিত হতো যে, শিক্ষার লক্ষ্য হলো এমন ব্যক্তিত্ব ও মনের স্ফুরণ যে মন কোনপ্রকার সংস্কার ও মোহ দ্বারা শৃঙ্খলিত নয়, যে মন স্বাধীন,

নিস্পৃহ, মানবিক শ্রেয়সের পথে ধাবিত। আমাদের নিকট তিনি ছিলেন এরই প্রতীক, সেই ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছাত্রজীবনে অস্পষ্টভাবে, পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষভাবে, এবং বর্তমানে ঐশ্বর্যশীল স্মৃতিতে প্রতিদিন অনুভব করি।

কিন্তু মনুষ্যত্ব তথা মানবিক সত্তা থেকে বিচ্যুত মানুষেরা সংখ্যায় কম নয়; বস্তুত, সংখ্যায় তারাই অগণিত। আমার কলেজীয় বৃত্তের আবর্তনের পথে একদা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম, যেখানে মানুষের মনুষ্যত্বের তত্ত্বটাই ছিল অস্বীকৃত। সীমাহীন বীতশ্রদ্ধা, ঘৃণা, ক্রোধ আর আত্মবিক্ষোভের মধ্যে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ঐ পরিস্থিতির কলুষ থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। আমাদের কাল অবক্ষয়ের পথে কী কদর্যতায় স্খলিত, ঐ অভিজ্ঞতা তার দৃষ্টান্ত। তা উন্মোচিত না করলে কালের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, মানবিক শ্রেয়সের প্রতিও।

পশ্চিমবাংলার একটি ছোট মফঃস্বল সহর। নতুন কলেজ, সুতরাং নিজস্ব বাড়ি নেই। বিত্তবানদের দেওয়া একটি বাড়িতে কোন প্রকারে কলেজ চলে; আর ওদেরই দেওয়া একটা বাগানবাড়িতে থাকেন কয়েকজন অধ্যাপক এবং কলেজের কর্ণধার, অর্থাৎ অধ্যক্ষ। আসলে বাড়িটা একটা বড়ো হলঘরের মত, চার কোণে, সামনে পেছনে, চারটে ছোট লাগোয়া ঘর। সামনে এবং পাশে প্রশস্ত বারান্দা। সামনের একটি কোণের ঘর অধ্যক্ষের। দীর্ঘ, বলিষ্ঠদেহী, সুপুরুষ নয় তবে যে কোন আসরেই তাঁর উপস্থিতি দৃষ্টিযোগ্য; পর্যাপ্ত প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহার তাকে আরও অনিবার্য করে তোলে। অহমিকায়-ঠাসা এই মানুষটি ছিলেন মারাত্মক রকমের আত্মপ্রিয়। তা পোশাকে আর চলন বলনে যেমন অভিব্যক্ত, তেমনি অভিব্যক্ত তাঁর রিরংসার কাহিনীগুলো অন্যের শ্রবণে ঢেলে দেওয়ার উৎকট আগ্রহে। ঐ সব কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রকাব্যের আবৃত্তি দ্বারা তাঁর আচরণ ও মানসবৈশিষ্ট্যকে

বৈদগ্ধমণ্ডিত করার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত। তাঁর প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য ছিল, সকল অধ্যাপকের মাইনের টাকা তিনি নিজেই তুলে নিতেন, এবং তাঁর নিজস্ব সুবিধা ও অবকাশ অনুযায়ী কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিতেন। এ ছাড়াও, অর্থের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক মমতা কর্তৃপক্ষের সন্দেহ ও আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল।

এই প্রত্যয়ে তিনি বলিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর মত ব্যক্তিত্বের মানুষেরা সমাজে অ-সাধারণ। আর যেহেতু তারা কর্মোদ্যমে প্রবল, সেই হেতু সমাজকে তাদের আচরণের দাপট স্বীকার করে নিতেই হবে, নতুবা সমাজই তাদের অবদান থেকে হবে বঞ্চিত। যুগ যুগ ধরে সমাজ তাদের প্রতি প্রশ্রয়ভাবাপন্ন থেকেছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমার আগে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন, ঐসব রসাল কাহিনী তাঁদের বহু বার শোনা হয়ে গিয়েছিল ; আমি নতুন, সুতরাং এসবের পুনরাবৃত্তি অনিবার্য হয়ে পড়ল। কাহিনীগুলো পরিবেষিত হতো সাধারণত বৈকালীন আড্ডায়, রাত্রিতে খাবার টেবিলে।

এইসব অমার্জিত আদিরসাত্মক কাহিনী শোনায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম না, আমার দীক্ষা অন্যপ্রকার। তবু, পরিস্থিতি উপলব্ধি করার জন্য যে কিছু দিন সময়ের প্রয়োজন, ততদিন নিশ্চুপ গ্রহণ করতেই হলো। তারপর থেকে মাঝে মধ্যে, কাহিনীর প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, প্রতিবাদের, সমালোচনার, নৈতিক মূল্যবোধের একটি দুটি বাক্য তাঁর উদ্দেশে নিক্ষেপ করতে লাগলাম ; এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তা এক সন্ধ্যায় তুমুল তর্কে, পরিণামে বিতণ্ডায়, পর্যবসিত হলো। চলল গভীর রাত্রি পর্যন্ত। তাঁর দাবি স্বাতন্ত্র্যের দাবি, যা দুর্বার, আত্মসুখ-সন্ধানী, যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যবোধের উর্ধ্বে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক সংহতি ও সামঞ্জস্যের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ; সংহতির চেয়েও বড়ো হলো ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা।

আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত। মানবিক বিবর্তনের ইতিহাস তো ঐ আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বায়নের ইতিহাস। প্রত্যেক সমাজই কিছু কিছু

নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধকে তার অভিব্যক্তির স্বরূপ বলে গ্রহণ করে ; ঐ মূল্যবোধ সামাজিক আচরণে আনে সুস্থতা ও শৃঙ্খলা, আর সমাজ-প্রবাহকে দেয় এগিয়ে চলার গতিবেগ। শৃঙ্খলা শব্দটায় তাঁর ভীষণ অনীহা ; তাই উত্তরে বলতেই হয়, প্রতিটি মানুষই যদি আপন আপন আকাঙ্ক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও চরিতার্থতার দাবিতে স্বেচ্ছাচারী হয় তাহলে তো সংঘবদ্ধ সমাজ-জীবন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, মানুষ অবনমিত হয়, সৃষ্টি হয় অরণ্যের।

বলা বাহুল্য, উভয় পক্ষেই উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল প্রচণ্ড, বিতর্ক অমীমাংসিত রেখেই আমরা ঘুমুতে যাই। কিন্তু, অতি প্রত্যুষে, ঘুম ভাঙ্গার আগেই, অনুভব করলাম কে যেন জোরে ঠেলছে আমাকে। তাকিয়ে দেখি তিনি। বললেন, আই ওয়াজ মাচ্ প্লিজড উইথ ইউ লাস্ট নাইট। [গত রাত্রিতে তিনি আমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন] প্রশংসা বটে, কিন্তু দারুণ বিরক্তিতে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। একজন ঘনিষ্ঠ অধ্যাপককে কাহিনীটা শোনালাম ; তিনি মন্তব্য করলেন, আরও কত দেখবেন !

এই ঘটনার আগে কি পরে ঠিক স্মরণে নেই, অধ্যক্ষের কলকাতার বাসভবনে আমার সাক্ষাতের তারিখ নির্ধারিত ছিল ; সম্ভবত মাইনের কিস্তি সংগ্রহের প্রসঙ্গ ছিল। গিয়ে দেখি তিনি বাইরের ঘরে প্রতীক্ষারত, টেবিলে একটা এটাচি। ভাবলাম, টাকার বাক্স বুঝি। না, আমার ভুল হয়েছিল, ওটা টাকার নয় চিঠির বাক্স। অল্পক্ষণ পরেই সেই বাক্স খুলে তাঁর নিকট বিভিন্ন বয়সে লেখা বিচিত্র সব মেয়ে ও মহিলার প্রেমপত্র—হ্যাঁ প্রেমপত্র—পাঠ করে শোনাতে লাগলেন আমাকে। আমার মাথায় আকাশের বিস্ময় ভেঙ্গে পড়ল। এমন একটা কুৎসিত—বলা উচিত অশ্লীল—কালবিন্দুতে সংস্থাপিত হব, আমার উদ্দামতম কল্পনায়ও কখনও ভাবি নি। অথচ, সেই মুহূর্তে আমি নিরুপায় ; টাকার প্রশ্ন ছিল, ছিল অধ্যক্ষ-গৃহিণীর অনুরোধ চা খেয়ে যাওয়ার জন্য। সুতরাং, মনটাকে উপস্থিত মুহূর্ত থেকে যত দূর সম্ভব নির্বাসনে পাঠিয়ে

নির্বোধের মত বসে রইলাম। ঐসব প্রেমপত্রের বাসনারঙীন শব্দগুলো আমার চারপাশে কী মোহমদিরার আবর্ত সৃষ্টি করে চলছিল কে জানে!

কিছুদিন বাদে মেসে আবির্ভাব ঘটল মেসে অবস্থানকারী একজন অধ্যাপকের যুবতী ভগিনী এবং যৌবন-উত্তীর্ণা মায়ের। আবহাওয়ায় রঙ লাগল। দু-চার রাত্রি পার হতে না-হতে আকাশে অদ্ভুত অদ্ভুত তারারা ফুটে উঠতে লাগল। এ বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা তাদের রহস্যভরা আলোয় অকস্মাৎ সচকিত হয়ে উঠতে লাগল। নিঃশব্দ চরণের সঙ্গীত কোন এক বিন্দুতে এসে মিলিয়ে যেতে থাকল।

বন্ধুকে একদিন বললাম, পরিস্থিতি ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার। চাকরি ছেড়ে দিয়ে পালাব। তিনি আশঙ্কিত হলেন। তাঁরই চেষ্টায় তাঁর বাসস্থান সংলগ্ন একটি ঘরে আমার বসবাসের ব্যবস্থা হলো, আহারাদি তাঁরই বাড়িতে। আপাতত একটা বিকল্পের আশ্রয় মিলল অবশ্য, কিন্তু কলেজে গেলেই তো রিরংসার প্রতিমূর্তি অধ্যক্ষ এবং সেই কবন্ধ অধ্যাপকের মুখ। ক্ষণে ক্ষণে আমার শরীর শিউরে উঠত, আর তীব্র বিবমিষা আমাকে অস্থির করে তুলত।

মেস পরিত্যাগের সপ্তাহ তিনেক বাদে একদিন বিকেলে সেখানে যেতে হয়েছিল কি এক প্রয়োজনে। অধ্যক্ষকে মনে হলো কেমন যেন সুদূর, অন্যমনস্ক। কথায় কথায় বললেন, তুমি মিছিমিছি নৈতিক মানদণ্ড, মূল্যবোধ, এসব কথা বল, অরবিন্দ; কিচ্ছু না কিচ্ছু না, কোথায়ও কিচ্ছু নেই। সব মিথ্যা, অবাস্তব। আজ থেকে দশ বছর বাদে যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় তো জিজ্ঞেস করো, এখানে সত্যি কি ঘটেছিল।

বললাম, তার কোন প্রয়োজন নেই। আই ক্যান সেন্স ইট ইভেন নাও।

—তুমি বুঝতে পেরেছ, সত্যি বুঝতে পেরেছ?

—পেরেছি।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ক্ষোভ, ঘৃণা আর বিবমিষা ক্রমে

ক্রমে আমার সত্তাকে এমন প্রগাঢ়ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে একদিন পদত্যাগ পত্র পেশ করলাম। বিস্ময়াবিষ্ট অধ্যক্ষ আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন নি, দীর্ঘ ছ'মাসের ছুটি দিয়েছিলেন—যদি আমার সংকল্পের পরিবর্তন ঘটে। বলেছিলাম, বৃথাই। আমি যেখান থেকে চলে যাই, সেখানে আর কখনও ফিরে আসি না। এখানেও ফিরব না।

রিরংসার নৈরাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি। চাকরি ছাড়লাম, সম্মুখে দুঃসহ বেকারত্ব। তথাপি মনে হতে লাগল, আমি যেন মুক্তির আস্বাদন লাভ করেছি ; মানুষের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসে পুনরায় আকাশে বাতাসে আপন সত্তাকে ছড়িয়ে দিতে পারব।

কলেজীয় বৃত্তের অভিজ্ঞতায় এ এক কলুষ-কলঙ্কিত চিত্র, কিন্তু প্রতিটি রেখায় সত্য। চিন্তামননে আচরণে মনুষ্যত্বের স্বীকৃতিহীন, অন্বেষণহীন মানুষেরা এসব বিন্দুতে অন্ধকার ছড়ায়, ছড়ায় কর্দম। ভয়াবহ এই অবক্ষয়ের আরও অসংখ্য কাহিনী শুনেছিলাম কৈলাসচন্দ্র আচার্য মশায়ের মুখে। সেই সব কাহিনী লালসার দৌরাত্ম্যে এমন নির্লজ্জ যে মানুষকে তার মনুষ্যত্বে আবিষ্কার করা সুকঠিন। আমি যখন নিজেকে আচার্য মশায়ের অভিজ্ঞতায় ও কালে প্রসারিত করি, তখন উপলব্ধি করতে পারি জৈবিকতার কোন্ গহ্বরে এই অবক্ষয়ের মূল নিহিত। অথচ, জৈবিকতার ঊর্ধ্বায়নেই তো মনুষ্যত্ব, মানুষের সংস্কৃতি। আমাদের কাল কি এর স্বীকৃতিতে প্রসন্ন নয় ?

ভাবতে বিস্ময় লাগে, মনুষ্যত্বের যে অন্বেষণ পূর্বোক্ত কলেজীয় বৃত্তে পাই নি, তা পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছিলাম আমার ফেলে-আসা তীর্থক্ষেত্রে—ময়মনসিংহের স্কুলে ; স্কুলের পণ্ডিত মশাই বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্যের চিন্তামননে।

১৯৫৩ সনের গ্রীষ্মকালে ময়মনসিংহ গিয়েছিলাম। শুনলাম, পণ্ডিত মশাই সেখানেই রয়েছেন, যদিও স্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন দীর্ঘকাল। আর দেশবিভাগেও বিচলিত হন নি। বিকেলে গেলাম।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আগন্তুককে দেখে সবিস্ময়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, তুই নাকি কম্যুনিস্ট হয়েছিস ?

—হয়েছি কি না জানি না, হওয়ার চেষ্টা করছি।

—কেন, কমুনিস্ট হতে চাস কেন ?

বললাম। বর্ণভিত্তিক সমাজই হোক আর অর্থনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক সমাজই হোক, প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় কিভাবে শোষণ, পীড়ন, অবিচার, অবদমন, ইত্যাদি চলে ; কিভাবে একের শ্রম অন্যে অপহরণ করে, একজনের উৎপাদিত ফসল আরেক জন উপভোগ করে, ধনোৎপাদন করেও সেই ধনে অধিকার জন্মায় না ; এমন কি, খাদ্যশস্যের ব্যাপারেও অ-সম অধিকারকে কিভাবে সমাজ-সংগঠনে বিধিবদ্ধ করা হয় এবং হয়েছে, যার ফলে এক প্রান্তে ভোগ ও অপচয়, অন্য প্রান্তে হাহাকার, দারিদ্র্য ও মৃত্যু। ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্বের ভিত্তিতে গঠিত সমাজে মানব ব্যক্তিত্ব কিভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, বিনয়-নম্র সৃজনমুখী ব্যক্তিত্বের বদলে কিভাবে উদ্ধত, লালসা-কলুষিত, নৈতিক মূল্যবোধহীন ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ঘটে, ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করলাম। সংযোজন করলাম আর্থিক প্রাধান্য অর্জন এযুগের একমাত্র জীবনদর্শন হওয়ায় সব রকমের অপরাধ প্রবণতাকে বর্তমান সমাজব্যবস্থা উজ্জীবিত করে রেখেছে। শুনে পণ্ডিত মশাই প্রশ্ন করলেন, সমাজকে না ভেঙ্গে কি এসব দূর করা সম্ভব নয় ?

—নয়। কারণ, একের শ্রমের ফসল অপরের লুণ্ঠন, শোষণ এবং অন্যায়-অবিচার যদি দূর করতে হয় তাহলে অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, সম্পর্ক, ইত্যাদি বদলাতে হয়। তার মানেই প্রচলিত সমাজ সংগঠনের পরিবর্তন, ভাঙন ও নবরূপায়ণ।

ভাঙন শব্দটা পণ্ডিত মশাই-এর বিশেষ পছন্দ নয়, পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। প্রশ্ন করলেন, কি করতে চাস তোরা ?

—সে এক বিপুল ব্যাপার। তবে, মৌলিক অঙ্গীকার হলো ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বামিত্বের চেতনার অবসান। দেশের ধনসম্পদে সামাজিক

অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, এবং তাতে সকলের অবিচ্ছেদ্য সমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এভাবেই লোভলালসা, অন্যায় অত্যাচারের মূল উৎপাটন সম্ভব হবে, এবং পরিণামে মানব ব্যক্তিত্বকে বিষয়-উপভোগ থেকে সৃজনশীল কর্ম ও ভাবনার পথে সর্বকালের জন্য প্রবাহিত রাখা যাবে।

—কম্যুনিস্টরা তো শুনেছি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, ধর্ম মানে না।

—ঠিকই শুনেছেন। ঈশ্বর তো মানুষেরই সৃষ্টি, পরাজিত মানুষের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে বশ করতে না পেরে মানুষ ঈশ্বরের কল্পনা করছে, এবং কোন এক ঐতিহাসিক লগ্নে ঈশ্বরভাবনাকে ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সৃষ্টি করেছে। এও তো মানুষের এক কাল্পনিক উপলব্ধি।

পণ্ডিত মশাই-এর চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হলো দেখে আমি পুনরায় সংযোগ করলাম, স্যর, আপনি তো জানেন, সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসকে প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা কিভাবে আপন স্বার্থ ও প্রতিপত্তি রক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করে, স্তোক বাক্য দিয়ে তাদের বশীভূত করে রাখে।

ঠিক এই স্তরেই পণ্ডিত মশাই পূর্বকথিত দক্ষিণ ভারতীয় পরিব্রাজকের কাহিনীটি পরিবেষণ করেন। তারপর আমার বক্তব্যের সূত্র ধরে বললেন, তোর বিশ্লেষণে তোদের মত, পথ এবং ভবিষ্যতের সমাজ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হলো। আচ্ছা, এবার বল দেখি, ম্যান-উম্যান বা নারী-পুরুষ সম্পর্কের মীমাংসা কিভাবে করবি।

এমন সহজ অনাসক্তভাবে পণ্ডিত মশাই নারী-পুরুষ সম্পর্কের কথা উত্থাপন করলেন যে আমি বিস্ময় বোধ না করে পারি নি। এবিষয়ে পুঁথিগত বিদ্যা আমার যা ছিল তা অবলম্বন করে উত্তরে বললাম, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় মেয়েরা নানাবিধ সংস্কার ও পারিবারিক বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ, নিগৃহীত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও ওদের কিছু নেই। সেজন্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন ইত্যাদি

চরিতার্থ হয় না, নিজস্ব নৈতিক দায়িত্ব সৃজন ও স্বীকৃতির অবকাশও কম। আমাদের ধ্যানের যে সমাজ সেখানে ঐসব বাধ্যবাধকতার অস্তিত্ব থাকবে না, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ওরা লাভ করবে, আর সেই সঙ্গে আসবে নির্বাচনের স্বাধীনতা। এটা জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেমন, প্রেমাস্পদ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। জাতীয় ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে ওদের ভূমিকা হবে অধিকতর ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, পুরুষের একাধিপত্যের ঘটবে অবসান। ফলে, মুক্ত, স্বাধীন, সৃজনশীল জীবনযাপনের স্বাদ লাভ করবে ওরা।

পণ্ডিত মশাই একটু হাসলেন, বললেন, আমার প্রশ্নটা তুই ঠিক বুঝতে পারিস নি। আমি বলছিলাম, নারী-পুরুষের যে যৌন বোধ আর এর পরিতৃপ্তির যে আকাঙ্ক্ষা তা বড়ো বিচিত্র, বড়ো জটিল, বড়ো—

তাঁর কথা শেষ না হতেই আমি বললাম, প্রেমাস্পদ বা জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা যখন থাকছে, তখন আর সমস্যা কি।

তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন, তোর দেখছি সাংসারিক অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব। জানিস তো, আমি কর-কোষ্ঠী বিচার করি। জীবনে অন্তত চল্লিশ হাজার মানুষের কোষ্ঠী বিচার করেছি; দেখেছি, যৌনতা বলিস আর প্রেম-লিপ্সাই বলিস, যত মানুষ তত বৈচিত্র্য। চল্লিশ হাজার মানুষ, চল্লিশ হাজার বৈচিত্র্য। একটা ফরমুলায় চল্লিশ হাজার বৈচিত্র্যকে কি করে ধরবি?

বড়ো কঠিন প্রশ্ন। এই ভুবন আমার জানা এবং অভিজ্ঞতার বাইরে; সুতরাং এর উত্তরও আমার অজানা। তবু, পুথিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সংযোজন করলাম, স্যর, আপনি তো এই অবক্ষয়ী পৃথিবীর মানুষগুলোকে দেখেছেন যাদের অহং-বোধ এবং ভোগের প্রবণতা অতিশয় প্রবল; আর সেজন্যই আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে এরা বিকৃত। আমরা যে নতুন সমাজের কথা চিন্তা করছি সেখানে বর্তমানের যাবতীয় সামাজিক মানবিক সম্পর্ক রূপান্তরিত হবে বলেই মানসিক দিক থেকেও মানুষ সুস্থ হবে, তার আকাঙ্ক্ষা অন্য পথে বাঁক নেবে।

—দূর! মানুষের কামনা-বাসনা কি এমন সহজ সরল রেখায় কখনও চলে? এর বিক্ষেপ অত্যন্ত গোলমেলে। আচ্ছা, তোকে একটা অত্যন্ত সাধারণ, পরিচিত দৃষ্টান্ত দিই। এমন তো আজকাল সর্বদাই ঘটছে—দুটো ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবেসে ফেলল, অথবা দুটো মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবেসে ফেলল। ফলে, এদের মধ্যে নানান ভাবানুরাগের আবর্ত সৃষ্টি হয়—প্রেমলিপ্সার সঙ্গে যুক্ত হয় ঈর্ষা, ঘৃণা, প্রতিহিংসা, ছলনা, মিথ্যাচার, ইত্যাদি। লক্ষ্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া। মন যখন এমনিভাবে তাড়িত হয়, তখন ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়, গুণগতভাবে মানুষ খাটো হয়। তোদের কম্যুনিস্ট সমাজে কি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না? যদি হয়, তা হলে এর কি সমাধান?

কঠিন পরীক্ষা। সত্যি, আমার কোন উত্তর নেই। আমি পরাজিত। এইরূপ ত্রিভুজাকৃতি সমস্যার সম্মুখীন কোন দিন হই নি; কর্মী বন্ধুদের কেউ এ সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন বলেও কখনও শুনি নি। তবু আমতা আমতা করে আবার বললাম, স্যর, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা স্বত্ব-স্বামিত্বের প্রচ্ছন্ন বোধ থেকেই এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি, আমাদের নতুন সমাজে তো ঐ বোধের কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

—নারে, অত সহজে আমি কন্‌ভিন্‌স্‌ড্ হবো না। এর থেকে ভালো উত্তর যদি কোথায়ও পাস তো আমাকে জানাস। শোন—

বলে পর পর দুটি কাহিনী আমাকে শোনালেন। ঐ অবসরে আমি আমার পরাজয়কে লালন করতে লাগলাম, এবং সবিস্ময়ে এই মানুষটির কথা ভাবতে লাগলাম। পণ্ডিত মশাই; সংস্কৃত পড়াতেন। সহজাত অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় অনুমান করতে পেরেছিলেন, সংস্কৃতে আমার অনীহা। তাই, সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী এই চার বছরের মধ্যে কখনও তিনি আমাকে পড়া ধরেছেন বলে আমার কোন স্মৃতি নেই। এটা তাঁর সঙ্গে আমার মানসিক দূরত্বের সূচক। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং কর-কোষ্ঠী বিচারে নিমগ্ন রয়েছেন, এই ছিল সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা। সেই মানুষ মানবিক শ্রেয়সের ভাবনায় এমন চিন্তাকুল, আর আমার মত

বয়সের ব্যবধানে একান্ত অর্বাচীন ছাত্রের সঙ্গে প্রায় অনালোচ্য বিষয় নিয়ে এমন বিষয়গত নির্লিপ্ততা, উদার জিজ্ঞাসু মনোভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করলেন! মন শ্রদ্ধায় ভরে গেল। মনে হলো, তাঁর মত মানুষেরাই তো দ্বি-মাত্রা অর্জন করে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে প্রসারিত হয়। কাহিনীর উপসংহারে মন্তব্য করলেন, মানুষের কামলিপ্সার সুসমঞ্জস মীমাংসা না হলে সমাজ ছত্রখান হয়ে যেতে পারে; আর মানুষ কখনও তার মনুষ্যত্বে পৌঁছাবে না।

সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি অনেকটা সহজ ও সাহসী হয়ে উঠেছি। আরও প্রত্যক্ষ প্রাজ্ঞ অভিমত জানার আগ্রহে বললাম, স্যর, যদি অপরাধ না গ্রহণ করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

—বল। যে কোন প্রশ্ন তুই জিজ্ঞেস করতে পারিস।

—আপনার এই বয়সে মানুষের কি যৌন আকাঙ্ক্ষা কিছু অবশিষ্ট থাকে?

নিঃসঙ্কোচ উত্তর এলো, থাকে না এ কথা বললে মিথ্যা কথা বলা হয়। আমি তোর কাছে মিথ্যা বলব না।

—এর কি নিবৃত্তি নেই?

—আছে। জানিস, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকাররা খুব রসিক লোক ছিলেন। [একটি শ্লোক আওড়ালেন] এর মর্মার্থ হলো, যদি তোমার মনে কামতৃষ্ণা জাগ্রত হয় তবে যেভাবেই হোক তুমি পরিতৃপ্ত হবে। তার জন্য যদি বলপ্রয়োগ করতে হয় তো তাও গ্রাহ্য। আসল কথা, তোমার বাসনার পরিতৃপ্তি। এ তো হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। তখনকার সমাজ কি প্রকার ছিল, জনসংখ্যাই বা কত ছিল, নৈতিক মানদণ্ডের বৈশিষ্ট্য কি ছিল, ইত্যাদি আমরা সঠিক জানি না। তখন সম্ভবত নারী-পুরুষের এই রাক্ষস-সম্পর্ক দূষণীয় বলে গণ্য হতো না। কিন্তু, আজকের সমাজ তো অন্য রকম, কত বিশাল, কত জটিল। বর্তমান কালের নীতিবোধও পৃথক। এখানে কি ঐ তত্ত্ব খাটবে, না বরদাস্ত করা হবে?

—তাহলে উপায় ?

—উপায় আছে। ঐ তোদের ফ্রয়েড—ফ্রয়েড যা বলেছেন তাই ঠিক, অর্থাৎ সাবলিমেশ্যন। যৌনলিপ্সার সাবলিমেশ্যন ঘটাতে প্যারলেই সমস্যার সমাধান, নইলে নয়।

পণ্ডিত মশাই-এর মুখে ফ্রয়েডের নাম শুনে অপরিসীম বিস্ময়ে আমি কথা হারিয়ে ফেললাম। তিনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী মানুষ, পূজাআর্চা করেন, মাথায় টিকিও দৃশ্যমান। বাহ্য এই আবরণের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছেন মনুষ্যত্বের সন্ধানে নিযুক্ত, নির্বাধ, সত্যের প্রতি ধাবমান একটি মন। আমার বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। আমার কলেজীয় বৃত্তে যে মূল্য-সচেতনতার সাক্ষাৎ আমি বিশেষ একটা পাই নি, তা যে আমার কৈশোরের তীর্থক্ষেত্র—আমার স্কুলে অস্তিত্বশীল ছিল তা কি আমি কখনও জানতে পেরেছি !

পণ্ডিত মশাই-এর কথার অনুরণন আজও শুনতে পাই। এর সঙ্গে মহাভারতের চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির কাহিনী সংযুক্ত করলে তা গভীরতর তাৎপর্যে উদ্‌ভাসিত হয়। বৃদ্ধ যযাতি তার এক পুত্রের দেহে আপন জরা সংক্রামিত করে এবং পুত্রের যৌবন লাভ করে এক হাজার বছর ইন্দ্রিয় সম্ভোগ করে। কিন্তু, সম্ভোগের পথে সে উপলব্ধি করে যে, ভোগ্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামতৃষ্ণার উপশম হয় না। তখন সে পুত্রকে যৌবন প্রত্যর্পণ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে। এই কাহিনীর প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতও সাবলিমেশ্যন বা কামনাবাসনার উর্ধ্বায়ন। আসলে, সৃজনশীল কর্ম ও শ্রমের প্রবাহে নিজেকে সতত প্রবাহিত রাখলে এবং ঐভাবে আপন ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন ঘটালে চিত্ত ও মনন নক্ষত্রলোকের পানেই ধাবিত থাকবে।

সেদিন পণ্ডিত মশাই-এর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। দীনতা ও সঙ্কোচে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম ; মনে হচ্ছিল. আমার প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ। বিপ্লবী তত্ত্বকে মানবিক সম্পর্ক ও বিস্তারের সমগ্রতায় আমি আয়ত্ত করতে পারি নি।

আত্মরতিতে নিমগ্ন বুদ্ধিজীবীরাও দ্বি-মাত্রা অর্জন অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রসারিত হয় না। ইতিপূর্বে বারট্রাণ্ড রাসেলের কথা উল্লেখ করেছি; দেখেছি, আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার আন্দোলনে তিনি বৃদ্ধ বয়সে সামিল হয়েছিলেন, হাউস অব কমন্সের সম্মুখে বিক্ষোভ ও অবস্থান সমাবেশে যোগদান করেছিলেন, গ্রেপ্তারও বরণ করেছিলেন। এ এক অতুলনীয় আদর্শ। আর আমি এবং আমরা? আপন আপন বিচ্ছিন্ন ভুবনে স্থিত থেকে আপন আপন ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করার কর্মব্যস্ততায় নিযুক্ত রয়েছি। এমন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীর সাক্ষাৎও পাওয়া যায় যে নির্দ্বিধায় বলতে পারে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সব দিক থেকে মানিয়ে চলা উচিত। আমার ব্যক্তিগত সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও একথা আমি বুঝি যে, এই মানুষও দ্বি-মাত্রা অর্জনে অনিচ্ছুক। ভবিষ্যৎ তার চিন্তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বহুদিন পূর্বে কবি-বন্ধু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ক্রান্তির' একটি সংখ্যায় দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-অধ্যাপক-চিকিৎসক-রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী সকলের সম্মুখে এই প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন, মানুষ এবং মনুষ্যত্বের ভাবনা আমাদের কতটুকু ঐকান্তিক? আমরা আমাদের বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব ও মনুষ্যত্বের স্বীকৃতিতে কতটা একনিষ্ঠ ও সরব? এই সমস্যা ও প্রশ্নটি সেদিন যেমন আজও তেমনি প্রকট এবং আত্যন্তিক। পরবর্তী একটি সংখ্যায় আমিও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। পুরানো সমস্যাটিকে বর্তমানেও সমান সজীবতায় উত্থাপন করা যায়, পারস্পরিক দায়িত্ববোধের যে চেতনা আমাদের অস্তিত্বের মূলে, মানব-অরণ্যের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সমাজ রূপান্তরের আমাদের যে অঙ্গীকার, সে সম্পর্কে সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কতখানি সচেতন? যদি বলি সচেতন, তাহলে মনুষ্যত্বের প্রাত্যহিক অবমাননায় তারা প্রতিবাদে আক্রোশে সংগ্রামে সোচ্চার হয় না কেন? কেনই বা নিত্যনৈমিত্তিকতার বন্ধন ছিন্ন করে ভবিষ্যতের প্রবাহে প্রসারিত হয় না?

সেদিনের কিছু বক্তব্য স্মরণে আনা যাক। "একথার নিশ্চয়ই কোন

প্রতিবাদ চলে না যে, আমাদের মনুষ্যত্ব ও মানবতার বোধ যদি প্রখর হত তা হলে বীরেনবাবু-কথিত দৈনন্দিন অবমাননাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হতাম। তা হলে নিশ্চয়ই অন্য সব সমস্যা ও প্রসঙ্গ থেকে এই অতিপ্রকট মানবতার প্রশ্নটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতাম এবং তদনুযায়ী সক্রিয় কার্যক্রমও গ্রহণ করতাম। হয়তো তখন "কুকুরের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট খাবারের ভাগ নিয়ে" কলহরত মানুষকে দেখে চোখও ফিরিয়ে নিতাম না, অথবা খাদ্যের কাঙাল শিশুর প্রতিও উদাসীন থাকতে পারতাম না। সম্ভবত কথাটা ঠিক হল না। হয়তো তখনও আমরা চোখ ফিরিয়ে নিতাম। ফিরিয়ে নিতাম এ কারণে যে, কোনো মহৎ একক প্রচেষ্টায় ঐ সমস্যার সমাধান হবার নয়, এবং এ কারণে যে একজনের দুঃখের লাঘবতায় সমস্ত মানুষের দুঃখের লাঘব হয় না। কিন্তু ফিরিয়ে নিয়েও আমার চিত্ত এই প্রত্যয়ে আত্মস্থ, উদ্ভাসিত থাকত যে, যে মনুষ্যত্ব রক্ষায় এই মুহূর্তে আমি অক্ষম তারই স্বীকৃতির জন্য বৃহত্তর সংগ্রামের আমি অংশীদার—সেই সংগ্রামের রাস্তাই আমার বরাবরের চলাচলের রাস্তা। সেই সংগ্রামই আমার মনুষ্যত্বের অঙ্গীকার, আমার মনুষ্যত্ব।"

একথা ঘোষণা করার দুঃসাহস সেদিন কজনের ছিল, আজই বা কজনের আছে? নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, খুব বেশি মানুষের নেই। আমাদের বোধ-বুদ্ধি-মননে একথা ধরা পড়ে না যে, এই দুঃসাহসের অভাব আমাদের মনুষ্যত্বেরই অস্বীকৃতি; এর অভাব আমাদের সার্বিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অবিশ্বাস্য দীনতার হেতু। প্রসঙ্গত সার্ত-এর একটি উক্তি স্মরণে আসছে। আলজিরীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে অগ্নিঝরা প্রচারপত্র রচনা সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ওদের হাতে রাইফেল তুলে দিতে পারছি না তাই লিখছি; পারলে রাইফেলই তুলে দিতাম। ভারতবর্ষের জীবন্মৃত শোষণজর্জরিত বাক্‌শক্তি-হীন মানুষের সম্পর্কে এ দুঃসাহসিক কথা উচ্চারিত হবে—এ আজ মনে হয় অতিশয় প্রত্যাশা। অথচ, আমাদের জীবনের বহু মুহূর্ত ঠিক ঐ বাক্যগুলো শুনবার জন্যই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকে।

নিষ্ফল প্রতীক্ষা। পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা নিয়েও বলি, আজ অধিকাংশ মানুষই এক একটি কস্তুরীমৃগ, আপন স্বার্থান্ধতার গন্ধে বিভোর। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আন্তর প্রকৃতি এমনি যে তা মানুষকে স্বার্থান্ধতার গণ্ডিতে চিরকাল অবরুদ্ধ রাখার জন্য অজস্র প্রলোভনে মাতিয়ে রাখে, এর নিরন্তর চেষ্টা মানব-অরণ্যের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সমব্যথিত্বের ঐক্য যেন কোনদিন গঠিত না হয়। আর স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়কদের জীবনদর্শনের কথা পূর্বেই বিশ্লেষিত হয়েছে। সেই নেতৃত্বের দুর্বিনীত আচরণ, মূল্যের আশ্রয়হীন দৃষ্টিমার্গ অত্যন্ত সার্থকভাবেই সাধারণ মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্বকে হত্যা করতে পেরেছে। কারণ, এ উত্তমরূপেই জানে, বিবেক ও মনুষ্যত্বহীন মানুষ কখনও আদর্শের আহ্বানে রাস্তায় নামে না ; জানে, ঐ মানুষ রাস্তাকেই বাঁচার রাস্তা বলে সহজে মানতে চায় না। জানে, আপন আপন বিযুক্ত সত্তা নিয়েই তারা তৃপ্ত থাকতে ইচ্ছুক।

রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব যাকে বিযুক্ত করে তাকে সংযুক্ত করাই তো আমাদের বৈপ্লবিক অঙ্গীকার। মানব-অরণ্যের যে ঐক্যের পথে তা বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সেই ঐক্যকে সংহত করে ভবিষ্যতের পানে ধাবিত রাখা আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। আমাদের চিন্তামনন, কর্মসূচী ও জীবনচর্যায় যদি এর প্রতিফলন না ঘটে তাহলে সেই অঙ্গীকার কপটাচারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। আর যে বিবেক ও মনুষ্যত্ব আজ নিহত, তাকে রাজনৈতিক কর্মোদ্যমের পথে যদি পুনরুজ্জীবিত না করা যায়, তাহলে বুঝতে হবে সেই রাজনীতি অন্তঃসারশূন্যতায় বিশুষ্ক।

॥ ৫ ॥

মানব-অরণ্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারার অন্যতম কারণ ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা এক মানসিক ব্যাধির শিকার, যার আধুনিক নাম বিচ্ছিন্নতা বা অনম্বয়। সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের উৎপত্তি ও বিকাশ, তাতে এটা অবধারিত

ছিল যে, স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে তারা দূরবর্তী হয়ে পড়বে; কারণ, পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, তাদের নিকট একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ ছিল স্বজাতীয়ত্ব থেকে বিজাতীয়ত্বে উত্তরণ। ক্রমে ইতিহাসের কালচক্র যখন উৎসমুখের দিকে প্রত্যাবর্তন শুরু করে তখন বিচ্ছিন্নতা জয় করা ছিল একটা মুখ্য সমস্যা।

বিভিন্ন প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক দল দেশের মানুষের সঙ্গে আত্মিক মিলন সংসাধনের জন্য যেসব লোক-কেন্দ্রিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছিল, তার বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। গান্ধীজী খাটো ধুতি-চাদর, সস্তা চপ্পল ও লাঠি ঐ একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন, অর্থাৎ দেশের মাটির সঙ্গে অন্বিত হওয়ার আত্যন্তিকতায়। অন্তত, ঐ পরিচ্ছদে তাঁকে 'আমাদেরই লোক' বলে গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে সহজতর হয়েছিল। বাংলার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কারাগারে এক সাক্ষাৎকারে তিনি অভিযোগ করেছিলেন তাঁরা দেশের মানুষকে চেনেন না, তিনি চেনেন। কিন্তু, তিনিও পরিপূর্ণ আত্মিক মিলনে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরে-ছিলেন কিনা বলা কঠিন। তবে, বুদ্ধিজীবীর দল যে এখনও পর্যন্ত অনন্বয় কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয় নি, তা তর্কাতীত।

কোন্ পদ্ধতিতে এই ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব, এ বিষয়ে প্রখ্যাত গান্ধীবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক নির্মল বসুর সঙ্গে আমার দু-চারটে পত্র বিনিময় হয়েছিল। একটি চিঠিতে তিনি ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে দীক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সমস্যাটির অতি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন। তাঁর চিঠিটি ছিল এই প্রকার:

C I/12 Pandara Park
New Delhi-3
31 August 1970

প্রিয়বরেষু,

২৯ তারিখের চিঠি পেয়ে খুব ভাল লাগলো। আপনার alienation সম্বন্ধে বক্তব্য সত্যিই ভাল লেগেছে। একথাও ঠিক যে ঐ সমস্যার

সমাধান এখনও হয় নি। আমি তো গান্ধীবাদী লোক, গ্রামে অতি সাধারণ চাষীর মধ্যে থেকে খাদির কাজ এবং তাদের পারিবারিক সুখ-দুঃখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তাদের ও শিক্ষিত আমাদের শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যবধান সেটিকে ভাঙতে পেরেছিলাম। অনেক দিন পরে (কয়েক বৎসরের পর) একটি চাষীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আমার সম্বন্ধে কি মনে হয় বল তো? তোমাদের মত ভাত খাই না, রুটি খাই। দিন রাত বইপত্র নিয়ে থাকি, তবু তফাৎ করে দাও নি কেন?' সে চাষীটি উত্তর দিয়েছিল, 'আমাদের ঘরেও তো বিধবারা থাকে, তাদের খাওয়া পরা সবই আলাদা। তবু তারা আমাদেরই একজন। তুমিও সেই রকম।' পরে সে একটি মজার গল্প বললো। কয়েকজনSocialist Partyর যুবক চাষীদের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য মাঠে লাঙল ধরে চাষীদের সাহায্য করতে যায়। শশী বায়েন (যে চাষীটির বাড়ির পাশে থাকতাম) বললেন, 'জানো দাদা, ওরা চাষী সাজবার চেষ্টা করলে কি হবে? গরু ওদের ঠিক চিনে নিলে যে, আনাড়িতে হাল ধরেছে। তখন যতই বাবুরা ধাক্কাধাক্কি করে, তারা আর চলে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিং নাড়তে লাগলো। তার পর আমি পাচন বাড়ি ধরতেই বুঝে নিলে যে চাষী এসেছে। বলদেরও চিনতে দেরি হয় না, কে চাষী আর কে চাষী নয়।'

আমার ধারণা দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সুখেদুঃখে আমাদের হৃদয় সাড়া দেয় না, যতটা দেয় বইয়ে পড়া চিন্তা বা ভাবনায়। অথচ মানুষের সঙ্গে ঐ আন্তরিক সম্পর্ক সাধনার দ্বারা (নিজের সংস্কারকে ভেঙে) প্রতিষ্ঠিত করলে তখন বই থেকে লব্ধ জ্ঞানেরও নতুন অর্থ পাওয়া যায়, জ্ঞান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। হয়ত সেই অবস্থার পর আমাদের চিন্তা ও কর্ম নতুন সমাজরচনায় কাজে লাগবে। বক্তব্য পরিষ্কার হল কিনা জানি না। নমস্কার নিবেদন। ইতি—

ভবদীয়
নির্মলকুমার বসু

অধ্যাপক বসুর বক্তব্যে জোর পড়েছে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের

সুখদুঃখে আমাদের হৃদয়-সংবেদ্যতার অভাবের উপর। ঐ সাড়া না দিতে পারাই অনন্বয়ের প্রত্যক্ষ-গোচর অভিব্যক্তি। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের মানসিক অবস্থান ও ভাবাদর্শের ভুবনকে বহু দূরবস্থিত' অর্থাৎ প্রবাসী করে দেওয়ায় বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে ঐভাবে সাড়া দেওয়া অতিশয় কঠিন হয়ে পড়েছে। শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কোন লাভ নেই, বস্তুত আমরা গড়েই উঠেছি বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে। জাতিভেদ এবং আহারে-বিহারে নানাবিধ বাধানিষেধের অনুশাসন, ইত্যাদি পরস্পর আত্মিক মিলনের পথে পর্বত-প্রমাণ অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছিল। ফলে, আমাদের চিন্তামননও বিবর্তিত হয়েছে 'ওরা-আমরা' এই দ্বৈত সত্তার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। ওরা ওদের সামাজিক পরিধিতে অস্তিত্বশীল, আমরা আমাদের পরিধিতে। সেখানে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, শোষণ আছে, মৃত্যু আছে। পুথিগত বিদ্যা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়েও আমরা তা জানি, কিন্তু সেই দুঃখের ও দারিদ্র্যের অংশীদার আমরা নই, অবরুদ্ধ সমাজ হতে দেয় নি। বরং, দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে আমাদের অবস্থান নিরাপদ দূরত্বে নির্দিষ্ট বলে আমরা নিশ্চিন্ত।

সুতরাং আমাদের সংবেদনশীলতা বাঞ্ছিত পথে কর্ষিত হয় নি। এমন কি, ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন যারা দেখেছে এবং বৈপ্লবিক কর্মে আত্মোৎসর্গও করেছে, তাদের সংবেদনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'আমাদের' সীমা লঙ্ঘন করতে পারে নি। একটি উদাহরণ দিই। সিমলা অবস্থান কালে কেরালার কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম অগ্রচারী নায়ক কে. দামোদরনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। একটা সেমিনার উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কোন একটা দ্রষ্টব্য স্থান থেকে ফেরার পথে বাস বিকল হওয়ায় আমরা পায়ে হেঁটে রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে আমি ও দামোদরন পাশা-পাশি হাঁটছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, একজন পাহাড়িয়া বিপরীত

দিক থেকে আসছে; খালি পা, ছেঁড়া অপর্যাপ্ত জামাকাপড় পরনে, মাঝে মাঝে হাত ও মাথা নেড়ে আপন মনে কি যেন বিড়বিড় করতে করতে আসছে। আমার মাথায় দুষ্টুমি চাপল, ভাবলাম কমরেড দামোদরনকে একটু পরীক্ষা করা যাক। ঐ লোকটি আমাদের সমান্তরাল হতেই আমি ওঁকে বললাম, 'লুক এট হিম কমরেড, হি ইজ ইণ্ডিয়া।' [কমরেড, ওর দিকে তাকান, ও আমাদের ভারতবর্ষ]।

কথাটা শুনামাত্র দামোদরন হো হো করে হেসে উঠলেন, এবং পেছনে যাঁরা আসছিলেন তাঁদের ডেকে চীৎকার করে বললেন, 'লিস্‌ন্, লিস্‌ন্, পোদ্দার সেয়জ্ হি ইজ ইণ্ডিয়া' [শুনুন, শুনুন, পোদ্দার বলছে ও নাকি ভারতবর্ষ]। বলে লোকটির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আরও জোরে হাসতে লাগলেন। আমার অপ্রস্তুত হবার কোনই কারণ ছিল না; আমি তো ওঁর সংবেদনশীলতারই পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। শুধু মনে মনে বললাম, মূর্খ! আমার কথার যে একটা গভীরতর তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা আছে তা তোমার বুদ্ধিতে ধরা পড়ল না। ধরা পড়ে না, শুধু দামোদরনই নয়, সাম্যবাদী কর্মী বলে পরিচিত বহু মানুষকে দেখেছি হৃদয়-বৃত্তিতে যারা দরিদ্র, জনসাধারণের দুঃখবেদনায় যাদের হৃদয় দ্রব হয় না। আসলে, 'ওরা' আছে, তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে আমরা তা জানি। হৃদয়-সংবেদনা দিয়ে জানি না। ওরা আমাদের জীবনের অঙ্গ নয়, আমরাও ওদের জীবনের অঙ্গ নই। আমাদের চিন্তার দ্বৈততা এত প্রবল।

অথচ ঐ দ্বৈততা ঘোচানোর উপকরণ ও পরিবেশ আমাদের জীবন-প্রাঙ্গণে অজস্রভাবে ছড়িয়ে রয়েছে; শুধু প্রয়োজন সংবেদনশীলতাকে প্রসারিত করা, আর প্রয়োজন আত্মাভিমান বর্জন। আমাদের ঐ সামগ্রিক বিফলতার দরুন ঐ সিমলাতেই কতদিন ধিক্কারে ধিক্কারে নিজেকে জর্জরিত করেছি; মনে হয়েছে মিথ্যা আমাদের দেশপ্রেম, মিথ্যা আমাদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। ওটা নিছক একটা বুদ্ধিমার্গীয় ভনিতা।

সিমলায়, বিকেলের দিকে, একটা দৃশ্য প্রায়ই আমাকে অতিশয় বিহ্বল, মর্মাহত করত। প্রতিদিনই দেখতাম, ত্রি-স্তরে বিভক্ত এই সহরটির সর্বনিম্ন স্তর অর্থাৎ কার্ট-রোড থেকে ধাপে ধাপে এবং মন্থর গতিতে কিছু সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ সর্বোচ্চ স্তরে উঠে আসছে; পিঠে ভারী কাঠের বোঝা, কোন কোন সময় তুলনায় হালকা ঘাসের বোঝা। এদের মধ্যে দু-চার জন ছিল মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ—শুষ্ক বিশীর্ণ দেহ, খালি পা, ছেঁড়া চটের পোশাক পরনে, মাথার চুল আর মুখের দাড়ি সম্পূর্ণ সাদা। শুধু অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন এই অমানুষিক পরিশ্রম ও কষ্টের নিকট নিজেদের উৎসর্গ করতে হয়েছে। বয়স ও বোঝার ভারে প্রায় ধনুকের মত বাঁকানো এই দেহগুলো চোখে পড়লেই আমি স্তব্ধ নিথর দাঁড়িয়ে থাকতাম, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলতাম। কোন এক কালবিন্দুতে ক্ষণিকের বিশ্রামরত ঐ বৃদ্ধদের কোন একজনের চোখের সঙ্গে আমার চোখের মিলন ঘটত। কী দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ আর নিরুক্ত অভিশাপ যে ঐ চোখ থেকে বিস্ফুরিত হতো তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। শত শত বছরের যন্ত্রণা তিক্ততা আর দাহ যেন ঐ চোখে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। অথচ, করার কিছু নেই। কিছুই না। তাদের এবং আমার নিজস্ব অসহায়তায় বিমূঢ় হতাম আমি।

মনে হতো, দামোদরনরা যাই মনে করুন, এরাই তো ভারতবর্ষ, আমাদের ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষের কাছে দিল্লীর স্বাধীনতা অর্থহীন। অর্থহীন কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী সরকার, অর্থহীন আমরা—তথাকথিত অগ্রচারী বুদ্ধিজীবীরা। কারণ, এই ভারতবর্ষ আমাদের দৃষ্টির অগোচর, অনুভবের অগোচর, রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার অগোচর। আত্মধিক্কারে ম্রিয়মাণ হতাম আমি। তাদের দুঃখদারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে আমার ফেলোশিপ এবং গবেষণা মনে হতো এক নিষ্ঠুর পরিহাস, মনুষ্যত্বের স্পর্শহীন একটা ঔদ্ধত্য। একটা নিঃসীম লজ্জা। আমার তৎকালীন মনোভঙ্গি কালীকৃষ্ণ গুহ-র একটি কবিতায় প্রতিধ্বনিত দেখতে পেয়েছিলাম, অনিন্দ্য বাক্‌প্রতিমায়, বিচিত্র ভাবানুষঙ্গে। কবিতাটি এইপ্রকার ঃ

আমকে আরও দীর্ঘ নীরবতা দাও, আমি অপরাধী।

মানুষের অমোঘ ইতিহাস রয়েছে শস্যক্ষেত্রে,
প্রতিদিনের রৌদ্রে, আত্মহননে—
আমি সবকিছু দেখতে চাই।

আমাকে আরও দীর্ঘ নীরবতা দাও, আমি
অমোঘ মানুষের কাছে যেতে চাই, কুয়াশায়, সূর্যাস্তের
মাঠে নতজানু প্রার্থনায়।

কিন্তু সেই অমোঘ মানুষের কাছে যেতে পারছি কোথায়। নতজানু প্রার্থনার বিনয়নম্রতা আমরা হারিয়েছি, হারিয়েছি হৃদয়ের সংবেদনশীলতা। সুতরাং, অমোঘ মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মিক মিলন সাধিত হচ্ছে না, হতে পারছে না। আর পারছে না বলেই এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবে উত্থাপন করা যায়, ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-মননে ঐ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন কতটা অভিব্যক্তি লাভ করে, অথবা তাদের দুঃখ-বেদনা-ক্ষোভকে সংগ্রামের ভাষায় রূপায়ণের এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের অধিকার, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কোনটাই কি তারা অর্জন করেছে, ভাষাকে অলংকৃত করার দক্ষতা ছাড়া?

১৯৭৯ সনে লোকসভার বাদল অধিবেশনের কালে যখন ক্ষমতাসীন জনতা সরকার অন্তর্কলহে পতনোন্মুখ এবং তথাকথিত জাতীয় এবং বাম-পন্থী নেতৃবৃন্দ আদর্শের নামগন্ধহীন সুবিধাবাদী রাজনীতির ভেলকি-বাজীতে প্রমত্ত, তখন 'আজকের ভারতবর্ষে/একজন পার্শ্বচরিত্রের নিভৃত চিন্তা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম। সেটি শারদীয় 'গণবার্তা' ১৩৮৬, সংকলনে প্রকাশিত হয়। তার উপসংহারে বলা হয়েছিল, "ইতিমধ্যে কিন্তু লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবের লগ্ন। আজ এই মুহূর্তে দিল্লীতে যে সার্কাসের খেলা জমে উঠেছে, তাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিবিম্বটি অতি সুন্দরভাবে প্রকটিত হয়েছে। মনে পড়ছে, ১৯৬৬

সনে উচ্চারিত ইংল্যাণ্ডের হাউস অব কমনসের শ্রমিক দলের জনৈক সদস্যের উক্তি : 'পার্লামেন্টের কথা ভাবলে সত্যসত্যই আমার ভীষণ লজ্জা বোধ হয় ; আমি আমার নির্বাচকমণ্ডলী এবং স্বদেশের নিকট আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই। তারা আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য, নির্বোধদের সার্কাসের খেলোয়াড় হওয়ার জন্য নয়।' ভারতবর্ষের নির্বোধদের সার্কাস দুটি সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে ; একটি হলো, ফ্যাসিস্ট শক্তির পুনরাবির্ভাবের পথ ; অপরটি হলো, বিপ্লবের পথে জাতীয় ইতিহাসের মোড় ফেরানো। আশঙ্কার কথা, যদি স্বৈরতন্ত্রী ফ্যাসিস্ট শক্তির পুনরাবির্ভাব ঘটে, তাকে ঠেকানোর প্রস্তুতি যেমন চোখে পড়ে না, তেমনি বৈপ্লবিক সম্ভাবনাময়তার সুযোগ গ্রহণের প্রস্তুতিও অনুপস্থিত। তাই একান্তভাবে সর্বদা অনুভব করি, মার্ক্সবাদী দলগুলো যদি সম্মিলিতভাবে, সার্কাসের খেলার পথে নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ভবিষ্যতের হাল ধরতে পারত—যদি হাল ধরতে পারত—"

ঐ নিভৃত চিন্তার মধ্যে একটা প্রত্যাশা ছিল : আজ মনে হয়, ঐ প্রত্যাশার পেছনে কোন যুক্তি ছিল না। কারণ, যাদের কেন্দ্র করে ঐ প্রত্যাশার আবর্তন, তারা শুধু অন্তঃসারশূন্যতায় দীন নয়, এক কথায় চরিত্রহীন। এই চরিত্রহীনতা শুধু মানুষের নিকট পৌঁছুতে না-পারার ব্যর্থতার মধ্যেই অভিব্যক্ত নয়, বৈপ্লবিক আদর্শের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা এবং উপস্থিত সুবিধাবাদের গরজে আদর্শকে বিকৃত করার বুদ্ধিমার্গীয় প্রবঞ্চনার মধ্যেও প্রতিভাত। চরিত্র-সংকটের এও এক চিত্র।

অবশ্য বলা যায়, ব্যক্তিত্বের এই অন্তর্লীন বৈপরীত্য, স্ব-বিরোধ, আদর্শে স্থিত না-থাকার দুর্বলতা, ইত্যাদি তো ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের উৎস ও বিবর্ধনগত বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত ছিল। তারা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থারই সন্তান, সত্য অর্থে অবৈধ সন্তান। ইংল্যাণ্ডের পিতৃত্ব তারা কখনও অস্বীকার করে নি। তাই দ্বিধা, পরিণামে আনুগত্য। কয়েকটি অতিশয় স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের মনোভঙ্গির কথা পুনরায় স্মরণে আনা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এর উপসংহারে এক চিকিৎসক আমদানী করে ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রচার করেছিলেন ; পরাধীনতার অন্তর্দাহে ছিন্নভিন্ন হলেও ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন নি— অর্থাৎ চাকুরী ত্যাগ করেন নি ; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজীবন তাঁর বশংবদতা স্বীকার করে গেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল অল্প কয়েক বছরের বামপন্থী রাজনীতির ঘূর্ণিঝড়ের পর স্বাধীনতার বদলে কমনওয়েলথ ভাবাদর্শের প্রচারকে পরিণত হন। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগ এবং সুসম্পর্ক বজায় রেখে আন্দোলন করা ছিল গান্ধী-রাজনীতির বৈশিষ্ট্য, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ছিল নিরন্তর এক প্রতিবন্ধক। গান্ধীবাদী আন্দোলন তা হলে এত বিস্তারিত হলো কিভাবে, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্মরণীয়, প্রথম পর্বে তাঁর অবদান স্বীকৃত হলেও পরবর্তী বিস্তার ও ব্যাপ্তিতে তাঁর কোনই ভূমিকা ছিল না। সংগ্রামের বিস্তার নেতৃত্বের গুণে নয়, নেতৃত্বের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও [not because of him, but in spite of him]।

ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট আন্দোলনও ঐ সহযোগবাদী মনোভঙ্গি দ্বারা কলঙ্কিত। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ঐ পার্টির পক্ষ থেকে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, তখন প্রকারান্তরে এ কথাই প্রচার করা হচ্ছিল যে কংগ্রেস হিন্দুদের এবং লীগ মুসলমানদের সংগঠন। এভাবে কংগ্রেসের জাতীয় ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে রাজনৈতিক অর্থে একে খর্ব করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির অনুকূল হয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের কালে গ্রেট বৃটেনের কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম স্থগিত রেখে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধপ্রচেষ্টায় পূর্ণোদ্যম সহযোগিতার কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলন ও মার্ক্সবাদের উপর এক সন্দেহের কালিমা লেপন করে। আজ অবধি তার অপনয়ন সম্ভবপর হয় নি।

আজ সাম্রাজ্যবাদ, ভারতবর্ষে, অস্তিত্বহীন ; কিন্তু সহযোগবাদী মনোভঙ্গি আজও তাদের চারিত্র-বৈশিষ্ট্য। শুধু পিতৃত্বের স্থানান্তর

ঘটেছে। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ভারতের বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী। বর্তমান ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর, অথবা তার কোন সীমিত অংশের, কোন প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সামাজিক ভূমিকা আছে কিনা, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী সুসম্পন্ন করবে কিনা অথবা আদৌ করতে পারে কি না, ইত্যাদি তাত্ত্বিক প্রশ্নের বিচার এ স্থান নয়। শুধু দু'টি ব্যবহারিক ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, যা আমার বিবেচনায় বামপন্থী মার্ক্সবাদী নেতৃত্বের মনোভঙ্গির দর্পণ।

প্রথমে কেন্দ্রে জনতা সরকারের বিপর্যয়ের দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া যাক। সেই সরকারের অংশীদার দক্ষিণপন্থী দলগুলো যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে পতনোন্মুখ, তখন অকস্মাৎ বামমার্গী ও মার্ক্সবাদী দলগুলো সংঘবদ্ধভাবে জনতা সরকারকে সমর্থন করার নীতি প্রত্যাহার করে এবং বিপর্যয়কে ঘনীভূত করে তোলে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামের মার্ক্সবাদী কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমর্থন প্রত্যাহারের নীতি কোনমতেই যুক্তিযুক্ত ছিল না। জনতা এবং কংগ্রেস (ই), এই দুই দলের মধ্যে যদি শত্রু মিত্র নির্বাচন করতে হয় তাহলে দুর্বল শত্রু হিসেবে জনতাকেই বাছাই করতে হয় ; এর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের অর্থ, বিষয়গত বিচারে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষ কংগ্রেস (ই) এর অনুকূলে বাতাবরণ সৃষ্টি করা। বামপন্থী নেতৃবৃন্দ সেদিন তাই করেছিলেন। আর, সঙ্কট যখন বিস্ফোরণের মুখে তখন মার্ক্সবাদী পণ্ডিত বলে পরিচিত একজন বামপন্থী নেতা অকস্মাৎ সাধারণ নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে বসেন। সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের নিরিখে এর যৌক্তিককা কি ছিল ?

একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যদি সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে মার্ক্সবাদী ও বামপন্থী দলগুলোর প্রভাব ও সংগঠন মজবুত থাকত এবং নতুন লোকসভা নির্বাচনে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ও পরিণামে সরকার গঠনের সম্ভাবনা থাকত, তাহলে নির্বাচনের ডাক নীতিগতভাবে

ও যুক্তিপরম্পরায় সুসঙ্গত হতো। কিন্তু, তৎকালীন পরিবেশে এবং লোকসভায় এদের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বিচার করলে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে এদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ছিল সুদূরপরাহত। ভাঙন এড়াতে পারলে জনতা সামগ্রিকভাবে অথবা সমাদর্শী দলগুলো স্বতন্ত্রভাবে কি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারতো? অসম্ভব; কারণ, ঐসব দলের নেতৃবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে যে সবাই উলঙ্গ রাজা তা জনসমষ্টির নিকট সম্পূর্ণ উন্মোচিত। নির্বাচন ছিল সর্বতোভাবে কংগ্রেস (ই) এবং তার সমর্থক ধনিকশ্রেণীর অনুকূল। তথাপি, ঐ আহ্বান দেওয়া হলো কেন? এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর দু'টি। এক, সেটা ছিল অর্বাচীন এবং রাজনৈতিক অজ্ঞানতাপ্রসূত; দুই, এ ছিল ইন্দিরা গান্ধীর মাধ্যমে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ক্ষমতার আসনে পুনর্বাসন দেওয়ার সচেতন প্রয়াস। যিনি ঐ নির্বাচনের ডাক দিয়েছিলেন, তাঁকে অর্বাচীন অথবা নির্বোধ বলার দুঃসাহস আমার নেই। সুতরাং, পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দ্বিতীয় উত্তরটাই মনে হয় সঠিক উত্তর। যবনিকার অন্তরালে যদি কোন নাটক অভিনীত হয়ে থাকে তবে তা চিরদিনের মতই অজানা থাকবে। তবে, শাসকগোষ্ঠীর সংকটের মুহূর্তে ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের বংশধরগণ কিভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে, এটা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯৮২ সনের সেপ্টেম্বরের শেষার্ধে মার্ক্সবাদী ও বামপন্থী দলগুলো আয়োজিত 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি' শীর্ষক পক্ষকাল-ব্যাপী আন্দোলন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তো সর্বকালের; সেজন্য দিনক্ষণ নির্বাচনের কোন প্রয়োজন হয় না, বরং তা মার্ক্সবাদী দলের প্রতিদিনের সংগ্রাম-কৌশলের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। ঐ কার্যক্রম অনুসারে স্থানীয় ভিত্তিতে অসংখ্য এবং কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে কলকাতায় এবং দিল্লীতে দুটি কেন্দ্রীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। কি বিশেষ কারণে ঐ সময়ে এই কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল, সে বিষয়ে গোড়াতেই আমার কিছু সন্দেহ ছিল। যাই হোক, যথা সময়ে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ এবং কনভেনশনে বক্তৃতার আহ্বান এলো। পদযাত্রায়

এবং কনভেনশনে যেসব স্লোগান উচ্চারিত এবং বক্তৃতা করা হলো, তাতে ন্যায়সঙ্গতভাবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণে আক্রমণে বিদ্ধ করা হলো, এবং সমান্তরালভাবে তাতে ছিল সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কদের শান্তি প্রচেষ্টার প্রশংসা। মার্ক্সবাদী নেতৃবৃন্দ যাঁরা সহ-বক্তারূপে কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের বক্তব্যেও এই বিষয়বস্তু প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু, ধনবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামও যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এই ব্যবস্থার বিলোপ সাধন না হওয়া পর্যন্ত যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না,—এই সত্য, প্রাধান্য দূরস্থান, উল্লেখিতও হলো না। সুতরাং, আমাকে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে হলো। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রামের যে দুটো দিক—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম—উভয় দিকের সুসমন্বয়ের ভিত্তিতে আমি বক্তব্য উপস্থাপন করি।

পাক্ষিক কার্যক্রম শেষ হলো; আর এর সপ্তাহ তিনেক বাদেই ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েট রাশিয়া সফরে গেলেন। তাতেই সময় নির্বাচনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলো। সেটা আর কিছু নয়, ইন্দিরার সফরকে প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে মার্ক্সবাদী দলগুলো আমেরিকার বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েটের অনুকূলে একটা রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে, যাতে প্রধানমন্ত্রীর সাদর অভ্যর্থনায় কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়, তাঁর প্রার্থনা সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচিত হয় এবং রুশ সহায়তা ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়। এই রহস্যেরও যদি কিছু নেপথ্য ইতিহাস থেকে থাকে তো আমি বিস্মিত হবো না। কারণ, বুর্জোয়া শ্রেণীর সংকটে মার্ক্সবাদীরা কিভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে, আলোচ্য আন্দোলন তার আরেকটি নজির এবং তা থেকে এটাও প্রমাণিত হয়, বিপ্লবের তত্ত্ব, বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিপ্লবের তত্ত্ব হিসেবে নয় বাণিজ্যিক পণ্য রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জনসমষ্টির সঙ্গে আত্মিক মিলনের পন্থা কি এই? এই কি বিপ্লব এবং মনুষ্যত্ব অন্বেষণের পথ? দ্বি-মাত্রা অর্জনের পথ?

এইসব রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের—আমিও তাদেরই একজন—কথা যখন ভাবি তখন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শোনা একটা গল্পের কথা অপ্রতিরোধ্যভাবে আমার মনে পড়ে যায়। গল্পটি তিনি শুনেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে এবং আমাদের শুনিয়েছিলেন নীহাররঞ্জন রায়ের বাড়িতে, আড্ডায়।

বর্তমান শতকের প্রথম দশকে পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সংগঠকদের অন্যতম সদস্য হিসাবে ধূর্জটিপ্রসাদ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্তর নাম উল্লেখ করেছিলেন; সম্মেলনের স্থান ও কাল উল্লেখ করেছিলেন কিনা এবং করে থাকলেও সেটা আমার স্মরণে নেই। সেই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা উচিত, যাত্রামোহন সেনগুপ্তর নামের সঙ্গে যুক্ত কোন সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির ঘটনা সম্পর্কে 'রবীন্দ্রজীবনী'তে কোন নির্দেশ আমার চোখে পড়ে নি; তাই, ঐ ঘটনার প্রামাণিকতা সুনিশ্চিত করা সম্ভবপর হয় নি। তথাপি, ঘটনাটি এমন ইঙ্গিতপূর্ণ এবং কালের আন্তর বেদনার সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত যে শুধু আস্বাদন নয় তার অর্থ-ব্যঞ্জনায় আমরা উদ্দীপ্ত হতে পারি।

সে আমলের রীতি অনুযায়ী তিন দিনের ঐ সম্মেলনের প্রথম দুদিন অতিশয় অলঙ্কারপূর্ণ প্রাণবন্ত ভাষায় দেশের পরিস্থিতি এবং সরকারী মনোভঙ্গির কৃপণতা, ইত্যাদি আলোচিত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনেও এর পুনরাবৃত্তি চলে, অর্থাৎ বক্তৃতার সারবত্তার অভাব ভাষার ঐশ্বর্য দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। অকস্মাৎ শ্রোতাদের মধ্য থেকে অল্পবয়স্ক এক তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে করজোড়ে প্রার্থনা জানায়, তার সামান্য কিছু কথা নিবেদন করার অনুমতি দানের জন্য। সে ছিল

অপরিচিত, সম্মানিত অতিথিদের সম্মুখে তাকে কিছু বলতে দিতে তাঁরা নারাজ। সেও নাছোড়বান্দা, দাঁড়িয়ে রয়েছে তো রয়েইছে, বসার নাম নেই ; আর মুখে সেই অনুরোধ। তার পীড়াপীড়িতে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় দ্রব হয় এবং তিনি ঐ তরুণের অনুরোধ রক্ষার জন্য উদ্যোক্তাদের উপরোধ করেন। তরুণটি বক্তৃতামঞ্চে উঠেই হাত জোড় করে শ্রোতাদের উদ্দেশ করে বলে, 'আমার একটি মাত্রই কথা, আর সেটি বলতে আমার এক মিনিটও সময় লাগবে না' ; এবং বলেই জোড় হাত বুকে ঠেকিয়ে একবার এপাশে আরেকবার ওপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'আমার বলবার কথা হলো, আমার আশেপাশে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা গত না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশের কিচ্ছু হবে না।' বলেই সে দ্রুতবেগে মঞ্চ থেকে নেমে গেল।

গল্পটি বলে রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদকে বলেছিলেন, 'এমন একটা নগ্ন সত্য এমন চমৎকারভাবে ছেলেটি বলল যে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে বুকে জড়িয়ে ধরি।' ঐ মন্তব্যের রেশ টেনে আমিও বারংবার বলি, ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের বর্তমান বংশধরগণ গত না-হওয়া পর্যন্ত সত্যি আমাদের দেশের কিছু হবে না। ঐ বংশধরগণ—নেতা, মন্ত্রী, প্রশাসক, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক—যে রূপেই জনগণের সম্মুখে অবতীর্ণ হোক না কেন, সব রূপেই তারা এক। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার সারাৎসার তারা অতি উত্তমরূপে জেনে নিয়েছে—টাকা কামাও, নয়তো নোংরা খেয়ে মর। এমন নির্বোধ কে যে দ্বিতীয় পথ ধরবে ?

সুতরাং, অবক্ষয়ী বর্তমানকে সৃজনশীল ভবিষ্যতে পৌঁছে দেবার জন্য যে পৌরুষ, ব্যক্তিত্ব, ত্যাগ-বীর্য, ইত্যাদি অপরিহার্য, এইসব অনন্বিত মানুষগুলোর মধ্যে তা আবিষ্কার করা কঠিন। অর্থাৎ, দ্বি-মাত্রা তাদেরও অনায়ত্ত।

॥ ৬ ॥

ঐ অনন্বয়ের সমস্যা স্মরণে রেখে, অগণিত বিপ্লবী কর্মীর অনভিপ্রেত রূপান্তরের কাহিনী সম্মুখে রেখে, এবং পেছনের দিকে তাকিয়ে এ প্রশ্ন সর্বদা আমার মনকে আন্দোলিত করে, আমাদের বিপ্লবী চরিত্র কি গঠিত হয় নি ?

এই প্রশ্নটি নিয়ে যখন ভাবি, তখন ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার যাবতীয় ইতিহাস আমার স্মরণে আসে। মনে উদ্‌ভাসিত হয় দুরন্ত দুঃসাহসিক সমস্ত অভিযানের চিত্র—বুড়ী বালামের তীরের যুদ্ধ, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ, মহাকরণ অভিযান, বিভিন্ন জেলখানা এবং বন্দী শিবির থেকে বিস্ময়কর পলায়ন, ছুটন্ত মেল ট্রেন থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়া, দীর্ঘ অনশনের মধ্য দিয়ে নিঃশেষে প্রাণ দানের কথা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য রোমাঞ্চকর সব পরিকল্পনার কথা, অকল্পনীয় প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অকুতোভয় পথ চলার সংকল্প, ইত্যাদি মনে ভিড় করে আসে। মনে পড়ে, পৈশাচিক অত্যাচার উৎপীড়নের মুখেও অগণিত যুবক কী অবিচল কর্তব্যপরায়ণতা, আত্ম-মর্যাদা, চারিত্রিক দৃঢ়তা আর সাহসের স্বাক্ষর রেখে গেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের নীরব ইতিহাসে। এমন কি, বিগত সত্তর দশককে বিপ্লবের দশক বলে চিহ্নিত করে যেসব যুবক স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠেছিল এবং ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যে আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে তাদের কথাও স্মরণে আসে। সংগ্রামের এই প্রবল ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের উত্তরা-ধিকার সত্ত্বেও বার বার পূর্বোক্ত প্রশ্ন মনকে আঘাত করে, আমাদের বিপ্লবী চরিত্র কি সত্যসত্যই গঠিত হয়েছে ?

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যারা দেহ্‌লী পার হয়ে গেছেন অর্থাৎ শহীদ হয়েছেন, তারা আমাদের বিচারের ঊর্ধ্বে। কিন্তু যারা দেহ্‌লী পার হতে পারে নি, এমন অসংখ্য বিপ্লবী কর্মী ও নেতাকে জেলখানার ভিতরে ও বাইরে দেখেছি, অনেকের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছে ; আবার

অনেকের রূপান্তর মনোবেদনার কারণ হয়েছে। বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা বাঞ্ছিত পরিণতি কেন লাভ করতে পারেনি, সে বিষয়ে কিছু সংখ্যক প্রবীণ বিপ্লবীর সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু, আলোচনার শেষে আমি পুনরায় আদি বিন্দুতেই ফিরে এসেছি এবং অনুভব করেছি, আমাদের বিপ্লবী চরিত্র গঠিত হয় নি। এমনি এক আলোচনার সময় একজন প্রাক্তন বিপ্লবী পাল্টা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, বিপ্লবী চরিত্র বলতে সত্যিই কি বোঝায়। কি বৈশিষ্ট্য সেই চরিত্রের ?

প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক। সুতরাং, বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হওয়ার আগে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। বছর দশ-বারো আগে 'বুদ্ধিজীবী : পেশাদার বিপ্লবী-কর্মী' শীর্ষক একটি নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছিলাম। সেই নিবন্ধে উপস্থাপিত বক্তব্য অবলম্বন করে বর্তমান আলোচনার যুক্তি সোপান নির্মাণ করা যেতে পারে।

দস্তয়েভস্কি তাঁর 'দ্য পজেজ্‌ড্‌' গ্রন্থে রাশিয়ার নেচায়েভপন্থী বৈপ্লবিক আন্দোলনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, নেচায়েভ একজন বিপ্লবী কর্মীর চরিত্র এঁকেছেন এভাবে—'বিপ্লবী কর্মী হলো অন্য থেকে স্বতন্ত্র, অনন্য। তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ নেই, নেই কোন আবেগানুভূতি বা কোন আকর্ষণ। তার কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই ; বস্তুতঃ, সে প্রকৃত অর্থে নামগোত্রহীন। তার সত্তার সব কিছু একটি মাত্র লক্ষ্য, একটি মাত্র চিন্তা, একটি মাত্র আবেগের নিকট উৎসর্গীকৃত,—তা হলো বিপ্লব। আত্মীয়তার বন্ধন, প্রেম, কৃতজ্ঞতা, এবং এমন কি আত্মসম্মান বোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ভাব অনুরাগ ইত্যাদি একটি মাত্র নিরুত্তাপ আবেগের নিকট সমর্পিত—বিপ্লব। বৈপ্লবিক উন্মাদনা তার প্রাত্যহিক অভ্যাস ; অবশ্য, এর সঙ্গে উত্তাপহীন ব্যবহারিক বুদ্ধি সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সর্বত্র এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে বিপ্লবের স্বার্থে যা যা করণীয় সে তা-ই করবে ; এ ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনই স্থান নেই।' নেচায়েভপন্থীদের বিরুদ্ধে বিচারের সময় তাঁদের একজন

উকিল আদালতে তাঁদের রাশিয়ার 'সর্বহারা বুদ্ধিজীবী' বলে উল্লেখ করেছিলেন। শুধু নেচায়েভপন্থী নয়, বিভিন্ন বৈপ্লবিক গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ অগণিত বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্যের একটি প্রবল বন্ধন ছিল,—তা হলো স্থিতাবস্থা বা জারতন্ত্রকে অস্বীকার। অস্বীকার অথবা 'মানি না'—এই হলো বিপ্লবী মনোভঙ্গির প্রাথমিক অঙ্গীকার।

ব্যক্তিগত স্বার্থচেতনা থেকে মুক্ত বলেই বিপ্লবী চরিত্রের মানসিক বিচরণ ক্ষেত্র সুবিশাল, তার অনুভবের জগৎও সুব্যাপ্ত। তাছাড়া, আধুনিক কালের শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞানানুশীলন, মানবিক চিন্তা, সত্য-ন্যায়-কল্যাণের আদর্শ, মানবিক ঐক্য, ইত্যাদি প্রত্যয়ের বিশ্বজনীনতা তার চিত্তাকাশে ভবিষ্যতের পৃথিবী সম্পর্কে এমন সব স্বপ্ন জাগায় ঐতিহ্যবাহী চিন্তায় যার কোনই স্বাক্ষর নেই। প্রচলিত রাষ্ট্রিক সামাজিক ব্যবস্থায় এবং এর মূল্যবোধের তালিকায় ঐ স্বপ্ন-জগতের কোন স্বীকৃতি নেই। সুতরাং বিপ্লবী যদি আপন আদর্শ ও আচরণে অবিচল থাকেন তো তাকে রাষ্ট্র ও সমাজ বিধায়কদের সঙ্গে এবং ঐতিহ্যবাহী মানস বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিয়োগ অথবা বিরোধের সম্পর্কে সম্পর্কিত হতেই হবে। উপায়ান্তর নেই। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এই বিরোধ ও সংগ্রাম, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ কাটা, এগিয়ে চলা। অন্য কথায়, রোমাঁ রোলাঁর অনুসরণে, কোন বিন্দুতেই থেমে যাওয়া নেই ; শাস্ত্রীয় উপদেশ অনুযায়ী, থেমে যাওয়াই মৃত্যু, এগিয়ে চলাই জীবন। সুতরাং এগিয়ে চলো। অর্থাৎ, সংগ্রাম চিরন্তন, বিপ্লব চিরন্তন। বিপ্লব চিরন্তন বলেই বিপ্লবী মনোভঙ্গি ও কর্ম বিপ্লবী চরিত্রের অস্তিত্বের অন্য নাম, তার নিশ্বাসের বায়ু। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই হাইতির জনৈক বিপ্লবী লেখক এই চমৎকার যুক্তি-সোপানটি নির্মাণ করেছিলেন, বিপ্লবের সংগঠন হলো সর্বোত্তম ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এবং সর্বোত্তম মানবিক মূল্য যা নতুন এক যুক্তি-কাঠামোর জনক—আমি বিপ্লব সংগঠন করি, সুতরাং আমি বেঁচে আছি, আমরা বেঁচে আছি।

এই মনোভঙ্গির মধ্যে একটি আশ্চর্য সজীব জীবনবোধ এবং

মানবিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের চেতনার স্বাক্ষর বিদ্যমান, ব্যক্তি হিসেবে একজন মানুষ তখনই সামগ্রিক সার্থকতা অর্জন করে, যখন সে জাগতিক সমস্যায় উদ্বিগ্ন হয়, মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তায় সতত ব্যাকুল থাকে, অশুভ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে, এবং সংগ্রামশীল মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার বোধে প্রসন্ন হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজ রূপান্তরের কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের পথেই একজন মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব সত্য হয়ে ওঠে; বিপ্লব-সংঘটনের অংশীদার রূপেই তার জীবন ব্যাপ্তি অর্জন করে।

বিপ্লব নিরবচ্ছিন্ন এবং চিরন্তন বলেই ঐতিহাসিক কাল বিভিন্ন স্তরে এর চারিত্র বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগে এর চরিত্র ছিল এক প্রকার, আর স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে এর প্রকৃতি ও লক্ষ্য অন্য প্রকার। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সন্তানদের চরিত্র-বর্ণনায় লিখেছেন, 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণ শীতলা শস্যশ্যামলা'—মাতৃভূমি। এই মনোভঙ্গি জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীর সঙ্গত ও আত্মপ্রত্যয়শীল মনোভঙ্গি। কিন্তু এই মনোভঙ্গি দিয়ে বর্তমান কালের বৈপ্লবিক আদর্শকে চিহ্নিত করা যাবে না। সেই আদর্শ জাতীয়তাবাদের সীমা পার হয়ে মানবিক ঐক্যের ভুবনে বিশ্বজাতীয়তাবাদে স্থিত। এর লক্ষ্য, ধনবাদী বিশ্বব্যবস্থার ধ্বংসের উপর সত্য, ন্যায়, স্বাধীনতা ও সমতার ভিত্তিতে স্থাপিত মানব সমাজ।

প্রশ্ন হতে পারে, ঐ লক্ষ্যে উপনীত হবার পর এমন দিন কি কখনও আসবে যখন বিপ্লবেরও অবসান ঘটবে? উত্তরে বলা যায়, মানবিক অভিযান যখন অন্তহীন, তখন বিপ্লবের সম্ভাবনাও অন্তহীন। কারণ, এই জাগতিক বিশ্বের সমস্ত বস্তুর আন্তর সম্পদ, গুণাগুণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন কোনদিনই নিঃশেষিতভাবে জানা যাবে না, তেমনি মানবিক

অভিজ্ঞতার সর্ববিধ বৈশিষ্ট্য, স্ব-বিরোধ এবং সংঘাতও চিরকালীন সমাধানের অতীত। সেজন্য, সব পেয়েছির রামরাজ্য যেমন অবাস্তব, তেমনি সর্বশেষ বা চূড়ান্ত বিপ্লবের ধারণাও ভিত্তিহীন। বরং ইতিহাসের আন্তর গরজকে আমরা এভাবে উপলব্ধি করতে পারি—সত্য, ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য জনসমষ্টির সংগ্রাম চলছে—চলতে থাকবে—অবিচ্ছিন্নভাবে ; ওই সংগ্রামের লক্ষ্য যদি অধিকতর সুখসমৃদ্ধি ও অধিকার অর্জন, তবে এর উপায় হলো ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র বিধায়কদের অপসারণ এবং নতুন রাষ্ট্রবিধায়কদের অভিষেক। কিন্তু এই বিজয় অগ্রগতির পথে এক নিশ্চিত স্তর হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নতুন এক আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব মাত্র। সেই আরম্ভর পথে যাত্রা থাকবে অবিচ্ছিন্ন এবং অকুতোভয়। যাত্রাপথে বহু বিপ্লবী কর্মী ও নেতা বিলীন হয়ে যাবে, ব্যর্থ সংগ্রামে শহীদ হবে কেউ, সাফল্যে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হবে কেউ। এক আরম্ভ থেকে আরেক আরম্ভের দিকে যাত্রা। সেই সংগ্রাম চলবে ততদিন মানবিক পৃথিবীর অস্তিত্ব যতদিন। এই অর্থেই বিপ্লব চিরন্তন।

এতটা বিস্তৃতভাবে সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্ত আকারে এই বক্তব্য আমার প্রশ্নকর্তা প্রবীণ বিপ্লবীর নিকট উপস্থাপন করেছিলাম। বিপ্লবী চরিত্রের প্রতিবাদী মানসভঙ্গির সঙ্গে আপন অন্তরের সাযুজ্য না থাকায় সম্ভবত তিনি এই যুক্তির আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, আমরা যে রকম শিক্ষা পেয়েছি সে রকমই গড়ে উঠেছি।

মুক্ত মানসিকতার অধিকার অর্জন করা সম্ভবপর হয়নি কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে অপর একজন বিপ্লবী অতিশয় জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন, সে চেষ্টা করব কেন আমি ? আমার সম্মুখে তখন একটি মাত্র লক্ষ্য—শহীদ হওয়া। আমি জেনেছিলাম, যে কোন মুহূর্তে আমাকে দেহ্‌লী পার হতে হবে। সেজন্য আমার আপ্রাণ সাধনা ছিল আমি যেন ব্যর্থ না হই ; যে সংকল্প, সাহস, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা আমার

নিকট প্রত্যাশিত আমার ব্যক্তিত্বে তার অভাব যেন না ঘটে। আমি সেইভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলাম।

—কিন্তু যখন সত্যসত্যই দেহ্‌লী পার হতে পারলেন না তখন?

—মনের উদ্যম আর তখন অবশিষ্ট ছিল না।

নিজেকে বিপ্লবী কর্মী রূপে গড়ে তোলার একাগ্রতা ও সংকল্প যেমন স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, এর ব্যর্থতার বিষণ্ণতাও তেমনি বেদনা-দায়ক। বাংলার প্রথম আমলের প্রথম সারির একজন বিপ্লবী নায়ক পরবর্তী কালে চীনে জাপানী আগ্রাসন নীতির সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি সম্পর্কে একজনকে প্রশ্ন করায় উত্তর পাওয়া গেল, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য তাঁর যে অসম সাহসিক প্রচেষ্টা, তা-ই আমাদের বিচার্য, তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপের বিচার অবান্তর। কিন্তু, তাতে যে বিপ্লবী মনোভঙ্গির এক অনিবার্য ফাঁক থেকে যাচ্ছে, এতে যে বৈপ্লবিক আদর্শের চিরন্তনতা অনুপস্থিত, তা তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত।

বলা বাহুল্য, এ ধরনের আলোচনায় মন প্রসন্ন হয় না। সেই একই সিদ্ধান্তে প্রত্যাবর্তন করতে হয় যে, আমাদের বিপ্লবী চরিত্র গঠিত হয় নি। অথচ, বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা যে ঐশ্বর্যশীল মানবিক উপাদান উম্মোচিত করেছিল, তার সামান্য পরিচয়ও আমাকে তুর্গেনিভের পূর্ব-উদ্‌ধৃত কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিত। কেন এই মর্মান্তিক পরিণতি, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিমার্গ থেকে এর নানাবিধ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যেতে পারে। আমার অভিজ্ঞতার ভুবন ক্ষুদ্র। সেখানে অবস্থান করে, সম্পূর্ণ আত্মগত দিক থেকে, ঐ জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আপনা থেকেই উদ্‌ভাসিত হয়। অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের বিপ্লবী চরিত্র গঠিত হয় নি—এ কথাটা আমি সাধারণভাবেই ব্যবহার করছি। এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়; ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু সেগুলো এত উজ্জ্বল যে তা ঐ সাধারণ সিদ্ধান্তটাকে আরও বেশি প্রকট করে তোলে।

একথার সম্ভবত কোন প্রতিবাদ করা যায় না যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের আত্যন্তিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ চিন্তা-মনন-কর্মের এক পরিধি নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন, এবং নৈতিক মূল্যমানেরও একটা কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন। সেই কাঠামোর সীমায় বিধৃত মন বৈপ্লবিক কর্মের একাগ্রতায় অনুপ্রাণিত হয়েছে সত্য। কিন্তু তার বিচরণ ক্ষেত্র অস্বাভাবিকভাবে সঙ্কুচিতও হয়েছে। আদিতে বিপ্লবী কর্মীদের একাধিক প্রতিজ্ঞাপত্র মেনে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হতো। তাতে উল্লেখিত যাবতীয় করণীয় এবং বর্জনীয় সূত্র অনুযায়ী ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হতো। পরবর্তী কালে এই বিধি প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু বৈপ্লবিক কর্ম প্রসারিত হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের পক্ষে বর্জনীয় আচরণের একটা ঐতিহ্য দানা বেঁধে ওঠে। বর্জনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল—আমোদ প্রমোদ বিলাসিতায় মগ্ন না হওয়া; জৈবিক প্রেরণা উৎসাহিত করতে পারে এমন গ্রন্থাদি পাঠ না করা; স্নেহমমতা ভালোবাসার বন্ধন ও মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা থেকে বিরত থাকা; স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত বিবাহ না করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। নেতাদের মুখে শুনেছি, অশ্লীলতার অভিযোগে এবং চরিত্র গঠনের পক্ষে সহায়ক নয় বলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ করা এক সময়ে বারণ ছিল; আর, নৈতিক নিষেধাজ্ঞা মেনে না চলতে পারার অপরাধে কোন কোন কর্মী বন্ধুদের হাতে লাঞ্ছিত, এমন কি খুন পর্যন্ত হয়েছে। আবার, উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঐ একই অপরাধ ক্ষেত্র বিশেষে মার্জনা করাও হয়েছে।

বিশ্লেষণী মন নিয়ে ঐ বর্জনীয় নিষেধাজ্ঞার দিকে তাকালে দেখা যাবে, তার মধ্যে রয়েছে যে সংসারে এবং মানবিক বিশ্বে আমাদের অবস্থান তার সজীব স্বাভাবিক মানব সম্পর্ক থেকে কর্মীদের মনকে বিচ্ছিন্ন করা অথবা সরিয়ে নিয়ে আসার একটা নির্দিষ্ট সচেতন প্রয়াস। তাতে বৈপ্লবিক একাগ্রতা প্রখরতর হয়েছে কি না জানি না, তবে সংবেদনশীলতা আহত হয়েছে; মনের গতি অবরুদ্ধ হয়েছে, বাস্তব পৃথিবী আশ্রিত

কল্পনা বিস্তৃত হবার অবকাশ পায় নি ; আর যে সমাজ-সংসারকে পুনর্গঠিত করার স্বপ্ন ছিল আমাদের, তা অজানা ও অস্পষ্ট থেকে গেছে।

প্রসঙ্গত, বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রণী পথিকদের অন্যতম কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার দু-একদিনের কথোপকথন স্মরণে আসছে। কিরণদার নৈতিক গোঁড়ামি ছিল প্রবল, এবং উপরে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা-গুলো তিনি যে শুধু মেনে চলতেন তাই নয়, মেয়েদের সম্পর্কে তিনি ছিলেন মাত্রাতিরিক্ত-ভাবে বিরূপ। একবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় শুনেছি মহিলা নার্সের বদলে পুরুষ নার্সের ব্যবস্থা করার দাবি তুলে জেদাজেদি করতে থাকায় দারুণ এক সংকট ও অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। সরকার কিভাবে ঐ সমস্যার সমাধান করেছিলেন আমার ঠিক স্মরণে নেই। তবে, এই ঘটনাটি তাঁর মনোভঙ্গির দর্পণ, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই।

দমদম জেলখানায় তিনি ছিলেন দলমত নির্বিশেষে অনন্য ব্যক্তিত্ব, সকলের প্রিয়। তরুণ রাজবন্দীরা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলো পালন করে কিনা, ধূমপান এবং দিবানিদ্রা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিহার করে কিনা, বীর্যবান চরিত্র গঠনের প্রতি মনোযোগী কিনা, এসব ব্যাপারে তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকত। তাঁর আদরের ডাক ছিল 'শূয়ার'; সতের বছরের তরুণকেও শূয়ার বলে ডাকছেন, আবার ষাট-উত্তীর্ণ বৃদ্ধকেও শূয়ার বলেই সম্বোধন করছেন। বেঁটে খাটো মানুষটি, চলতেন একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ; সেজন্য, তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল একটি লাঠি। দিনের বেলা কখনও ঘুমুতেন না ; তাই কারা ঘুমুচ্ছে সে খবর রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। এ সেল্ সে সেল্, এ ঘর সে ঘর ঘুরে তিনি খবরদারির কাজ করতেন ; এবং তাঁর স্নেহভাজন কোন যুবককে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেই তাঁর লাঠিটি নেমে আসতো তার পিঠে, আর মুখে সেই আদরমিশ্রিত ভৎসনা, শূয়ার! ঘুমুচ্ছিস ?

কেন জানি না, কিরণদা আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন, যদিও রাজনৈতিক মতবাদে আমরা ছিলাম ভিন্ন ভিন্ন শিবিরের লোক।

অবশ্য, তিনি তখন দলমতের ঊর্ধ্বে। প্রায়ই তিনি আমার খোঁজখবর নিতে আসতেন। আমার অধিনায়কত্বে একটি ফুটবল দল গঠন করা হয়েছিল; যদিও তিনি ছিলেন অন্য ওয়ার্ডের বাসিন্দা, তবু তিনি ছিলেন আমার দলের একজন উগ্র সমর্থক। দুপুরে আমারও ঘুমের অভ্যাস ছিল না; পুথিপত্রের বন্ধুতা তো ছিলই, তা ছাড়াও সময়কে বৈচিত্র্যপূর্ণ করার জন্য আমি দলীয় বন্ধু রঞ্জিৎ সরকারের নিকট ছবি আঁকা শিখতাম। ছবির বই বলতে রঞ্জিৎবাবুর কাছে তখন প্রাচীন গ্রীক দেবদেবীর স্কেচ্ দেওয়া দু-তিনটি পাতলা বই ছিল, বেশির ভাগই নারী মূর্তি। তাই দেখে পেনসিল দিয়ে অপটু হাতে কিছু আঁকা-জোকা করে কোন কোন দুপুর কাটিয়ে দিতাম।

একদিন আফ্রোদিতে না কার ছবি নিয়ে পড়েছি। আমার কি সাধ্য রেখায় সেই রূপকে ধরা! রেখা টানছি আর মুছছি, এমন সময় কিরণদা বেরিয়েছেন তাঁর দৈনন্দিন 'রাউণ্ডে'। বোধ হয় কেউ চুপিসারে দেখে গিয়েছিল আমি কি করছি। কারণ, কিছুক্ষণ বাদেই দেখি পরেশ গুহ, রঞ্জিৎ সরকার এবং আরও দু-একজন কিরণদাকে নিয়ে আমাদের ঘরে এসে হাজির। আক্রমণের ভারটা পরেশদাই নিলেন, কিরণদাকে সম্বোধন করে বললেন, 'দেখুন কিরণদা, আপনার আদরের দুলাল কেমন গোল্লায় গেছে; বেছে বেছে মেয়েদের ছবি আঁকছে।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন রে বাপু, ছেলেদের ছবি আঁকতে পার না?

এক ধমক দিয়ে কিরণদা ওঁকে থামালেন, তুই থাম শূয়ার। তারপর আমাকে বললেন, দেখি, কি এঁকেছিস।

খাতাখানা দিলাম, তিনি আমার বিছানার কোণায় বসলেন। ইতিমধ্যে পরেশ গুহরা চলে গেছেন। উপদেশের ভঙ্গিতে তিনি বলতে থাকলেন, আঁকাজোকা করছিস কর, কিন্তু চরিত্র আর মনোবল এ দুটো জিনিস খুব মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে। তাই, কখ্খনো প্রলোভনের পথে পা দিবি না, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা একদম করবি না।

কথায় কথায় কিভাবে যেন নজরুলের প্রসঙ্গ এসে গেল। নজরুল

সম্পর্কে প্রাচীনপন্থীদের যে মনোভঙ্গি এবং তাঁর সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে ঐ মহল যে সব বিশেষণ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন, একে একে সবই উদ্‌গীর্ণ হলো। তাঁর সমস্ত কথার সার কথা ছিল, ঐ শ্রেণীর মানুষগুলোকে আচ্ছা রকমের শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল যাতে আর কেউ ঐ রকম ব্যভিচারের পথে অগ্রসর না হয়। ব্যভিচারের অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা জানি না।

তাঁর বিক্ষুব্ধ দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হলে আমি বললাম, দাদা, এবার আমি একটু বলি। তিনি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লে আমি আরম্ভ করলাম, আমার চেহারা ভাল, এটা কি আমার অপরাধ? আমি ভাল গান গাইতে পারি, এটা কি আমার অপরাধ? আমি বিদ্রোহের কবিতা লিখি, এটা কি আমার অপরাধ? আমি বক্তৃতা দিয়ে মানুষের হৃদয়কে মাতাতে পারি, সেটা কি আমার অপরাধ? আপনি আদর করে আমাকে আপনার বাড়ি নিয়ে যান, সেটা কি আমার অপরাধ? আপনার বাড়ির মেয়েরা আমার গান শুনতে এবং আমাকে খাওয়াতে ভালবাসে, সেটাও কি আমার অপরাধ?

—থাম, থাম। ওই বদমায়েসটার হয়ে তোকে আর সাফাই গাইতে হবে না।

—না, সাফাই নয়: আপনি তো শুধু একটা দিক বিচার করছেন। এর তো অন্য একটা দিকও আছে, সেটা ভেবে দেখবেন না?

—না দেখব না। যতই গান শুনুক আর খাওয়াক, তোমার কেন আত্মসংযমের অভাব ঘটবে, তুমি কেন বিভ্রান্ত হবে?…তুই কখ্‌খনো ঐ রকমভাবে চিন্তা করবি না।

বলে চলে গেলেন। আরেক দিন বন্দীদের মধ্যে দু-একটি অবাঞ্ছিত চরিত্রকে কেন্দ্র করে কিরণদা তাঁর নৈতিক নিষেধাজ্ঞার পাঠ দিচ্ছিলেন আমাকে। এসব কথা বেশ কয়েকবার শোনা হয়ে গিয়েছিল আমার, সুতরাং কোন উৎসাহ ছিল না। তাই, আলোচনার সূত্র ধরে এক সময়ে

বললাম, আপনাদের ঐ নেতিবাচক জীবনদর্শন আমার ঠিক পছন্দ নয়। সমাজ-সংসার তার সুখদুঃখ প্রেমভালোবাসা স্বপ্ন ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে দুর্নিবার গতিতে বয়ে চলেছে। সেই প্রবাহ থেকে যদি আমরা নিজেদের সরিয়ে রাখি, তাহলে তার গতিধারা বুঝব কি করে ?

—তত্ত্ব দিয়ে বোঝ, উপলব্ধি দিয়ে বোঝ।

—অসম্ভব ; তত্ত্ব যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করা যায় তো সে তত্ত্ব ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমার কথা হলো, জীবনের সামগ্রিক প্রবাহের মধ্যেই আমি থাকব, কাজ করে যাব ; আপনার নিকট যা যা বর্জনীয় তা সব আমি করব—সিনেমা-থিয়েটার দেখব, নাটক-নভেল পড়ব, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করব, মদ খাব—

—না, ও কাজটি কখনো করো না —

হাসলাম। বললাম, দরকার হলে তাও করব—

—হুঁ হুঁ, তাহলে একদিন নর্দমায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবি।

—সে অঘটন কোন দিনই ঘটবে না। আমি নিজে যদি নিজেকে নষ্ট না করি, তাহলে দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যা আমাকে নষ্ট করতে পারে। সেই আত্মবিশ্বাস আমার আছে। আসলে কি জানেন, দাদা, আমি জীবনের সমস্ত প্রলোভনের মধ্যে থেকে কাজ করে যাব, চরিত্রের পরীক্ষা দেব এবং পাশ করব।

—অতটা বড়াই করিস না, পা পিছলে যাবে।

—যাবে না। আপনি তো জীবন থেকে সব সময় সরেই রইলেন, চরিত্রের পরীক্ষা দিলেন কখন ? দিলে…আপনি ফেল করতেন।

অনুভব করলাম, কিরণদার লাঠিটা বেশ একটু জোরেই আমার ঘাড়ে পড়ল ; ঠোঁটে কিন্তু হাসি, তারপর শুয়ার বলে ঠুক্ ঠুক্ করে চলে গেলেন। আজ দীর্ঘকাল বাদে ঐ স্মরণীয় সংলাপের এই অংশটুকু লিখতে বসে ভাবছি, দমদম জেলের প্রবীণতম বন্দীর [ঠিক খেয়াল নেই, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী কিরণদা থেকে বয়সে বড় ছিলেন কি না] নিকট এমন অনমনীয় স্পর্ধা কি করে প্রকাশ করেছিলাম, আর ঐ উদ্ধত

কটাক্ষ ? সম্ভবত পেরেছিলাম এ কারণে যে, আমার কথার পেছনে ছিল যুক্তি এবং স্নেহ-ভালোবাসার অধিকার। সে অধিকার তিনিই আমাকে স্নেহপূর্ণ সহৃদয়তা দ্বারা দান করেছিলেন।

কিরণদাকে প্রাক্তন বিপ্লবী নায়কদের প্রতিনিধি স্থানীয় বলে চিহ্নিত করা যায়; তাঁর মনোভঙ্গিও তাঁদের সম্মিলিত মনোভঙ্গির প্রতীক। তাঁদের মন কখনও এই ভাবনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় নি যে, মনের গতিশীলতা যত বেশি, ব্যক্তিত্ব ততই বড়ো; ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করার কোন চেষ্টা তাঁরা করেন নি। বরং, মনের বিচরণ ক্ষেত্র অনিবার্যভাবে সীমিত হয়ে পড়ায় তা বিশ্ববিহারের পথে অগ্রসর হবার সুযোগ পায়নি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠনের উন্মাদনার দিনগুলোতে সেই মন স্ফূর্তি লাভ করেছিল: কিন্তু ঐ দিনগুলো ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ মনও অবলম্বনহীন হয়ে পড়ে, এবং নিরালম্ব অবস্থায় স্তিমিত হতে হতে একদিন থেমে গেল। এগিয়ে যেতে পারল না, ঝরে পড়ল।

অন্য কথায়, বৈপ্লবিক ভাবাদর্শগত প্রত্যয়ের যে চিরন্তনতা একজন মানুষকে কোন বিন্দুতে থামতে দেয় না, তা অনুপস্থিত ছিল। একথা শুধু যে ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে প্রযোজ্য তা নয়, অগ্নিযুগের সমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কেই সাধারণ ভাবে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মনে হয়, শুধু মাত্র আবেগ দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে কোন মহৎ কাজের জন্য আত্মোৎসর্গ করা এবং ভাবাদর্শগত প্রত্যয়ে স্থিত থেকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থাকার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন নিঃসন্দেহে পাশব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই পাশব শক্তিকে স্বদেশের মাটি থেকে অপসারণের জন্য যে মানুষ শহীদের মৃত্যু বরণের উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে, তার সংকল্প ও হৃদয়াবেগ নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু, ঐ বিদেশী শাসন কোন্ কোন্ রাষ্ট্রিক অর্থ-নৈতিক সমাজ-সাংস্কৃতিক কারণে অশুভ ও নিন্দনীয়, তার সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে যে মানুষ বিকল্প স্বদেশী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিকল্পনা

রচনা করে এবং এর ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সংগঠিত করার পথে অগ্রসর হয়, গুণগত বিচারে তার সংগ্রাম ও আত্মদান অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করে। বিকল্প স্বদেশী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কথাটার উপর আমি জোর দিতে চাই। কারণ. এর স্বীকৃতিতেই ইংরেজ-বিরোধী নেতিবাচক সংগ্রাম বৈপ্লবিক গুরুত্বে ইতিবাচক হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গটিকে অন্যভাবেও উপস্থাপন করা যেতে পারে। ইংরেজ বিতাড়নের সংগ্রাম যুগপৎ ইতিবাচক এবং নেতিবাচক। যে মানুষের চিন্তা নিছক ইংরেজ বিতাড়নের কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যার চিন্তার অন্তর্গত নয়, তার সংগ্রাম ইতিবাচক হওয়া সত্ত্বেও নেতিবাচক। অপর দিকে, ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক-সামাজিক পরিকল্পনার সূত্র অনুযায়ী যে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম তা ইংরেজ বিতাড়নের মত নেতিবাচক কর্মের মধ্য দিয়েই সৃজনশীল সম্ভাবনাময়তার দরুন ইতিবাচক হয়ে ওঠে। বাংলার বৈপ্লবিক দল ও গোষ্ঠীগুলোর চিন্তায় এই ইতিবাচক দিকটার তেমন কিছু স্বাক্ষর ছিল না, সমাজতান্ত্রিক তথা সাম্যবাদী চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটার আগ পর্যন্ত তা নিতান্তই অস্পষ্ট ছিল। সেজন্য, বৈপ্লবিক দলগুলোর গণ-আন্দোলনের কার্যক্রম গ্রহণ করার মুখে বেশির ভাগ কর্মীই নিজেদের চিন্তা ও কর্মকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষে তাদের মনে হয়েছে সম্পূর্ণ বেমানান। এথেকে এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সামগ্রিকভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পেছনে ভাবাদর্শগত প্রত্যয়ের উদ্দীপনা ছিল না।

ছিল না যে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরমুহূর্তেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বর্তমান বৈশ্য সভ্যতার মনোভঙ্গির নিকট আত্মসমর্পণ করে প্রাক্তন বিপ্লবী দলের কিছু সংখ্যক নেতা ও কর্মী লাইসেন্স-পারমিট কেনা-বেচার খেলায় এমন মত্ত হয়ে উঠেছিলেন যা বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তো নয়ই, দস্তুরমত লজ্জাজনক। পরবর্তীকালে স্বাধী-

নতা সংগ্রামীদের জন্য সরকার যে পেনসনের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে নেতিবাচক রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার দিকটা আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।

যখন বঙ্গেশ্বর রায়ের নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীদের একটি প্রতিনিধি দল ভূপেশ গুপ্ত সহ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সংগ্রামীদের জন্য সাহায্যের আবেদন জানান, তখন আমি ছিলাম সিমলায়। সাংবাদপত্রে এই ছোট্ট সংবাদটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, কে যেন আমার মাথাটা মেঝেতে গুঁড়িয়ে দিলো। এতদিন বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রূপে ছিলাম উন্নতমস্তক, এই মুহূর্তে কে যেন আমাকে আছড়ে ফেলে দিল মাটিতে। কেবলই মনে হতে লাগল, ভিক্ষাবৃত্তি? শুধু বেঁচে থাকবার জন্য এই ভিক্ষাবৃত্তি? এই কি বিপ্লবী চরিত্র?

যতীনদা (ফেগা রায়) তখনও জীবিত ছিলেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে, কলকাতায়, পেনসনের বিষয় উঠলে তিনি বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, দেশের জন্য কি করেছি আমরা? তার জন্য আবার তাম্রপত্র, পেনসন! লজ্জা হয় না? এসব করেই আমাদের ইজ্জৎ শেষ করে দিল।

যতীনদার মত এমন আত্মমর্যাদাশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একনিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ বিপ্লবী দলে আমি খুব কম দেখেছি। তাঁর মত মানুষরা যদি সংখ্যায় বেশি হতো তা হলে আমাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের চরিত্র অন্য-রকম হতো। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে থেকে ছিলেন রিষড়া সেবা সদনে। মাঝে মাঝে যেতাম। প্রথম যেদিন কিশোরীদার (দত্ত) সঙ্গে সেখানে যাই, আমার সঙ্গে বোধহয় একটা ব্যাগ অথবা ঝোলা ছিল। সাদর সম্ভাষণের পরেই বললেন, ফলমূল কিছু আন নাই তো?

সলজ্জভাবে বললাম, না।

—ভাল করেছ, আনলে ফেরৎ নিতে হতো।

সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, এই ঘরে যত রোগী আছে তাদের সকলের জন্য কি তুমি ফলমূলমিষ্টি আনতে পারতে? যদি না পার

তো আমি তা নিই কি করে? আমি ফলমিষ্টি খাব আর ঐ বুড়োগুলো আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, এ কি সহ্য করা যায়? বিবেকে লাগে না?...এই সেদিন ভাইপোরা ফলমিষ্টি নিয়ে এসেছিল, সব ফিরিয়ে দিয়েছি। বলেছি, যেদিন সকলের জন্যে আনতে পারবে সেদিন নিয়ে আসবে, নইলে নয়।

মনে মনে বললাম, এ যতীনদারই উপযুক্ত কাজ। এ দৃষ্টান্ত শুধু বিরল নয়, বিরলতম। এরও বেশ কিছু দিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। তাঁর কোন ভাইঝির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হচ্ছিল। পাত্রপক্ষ নানা প্রকার যৌতুক দাবির সঙ্গে একটা মোটা অঙ্কের নগদও দাবি করছিল। এ নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটির সময় পাত্রপক্ষের একজন বলল, কেন দেবেন না? আমরা আমাদের ছেলেকে এম. এ. পাশ করিয়েছি—

অমনি যতীনদা বলে উঠলেন, আমরাও তো আমাদের মেয়েকে বি. এ ফেল করিয়েছি, এমন কি তফাৎ?

যাই হোক সম্বন্ধ ঠিক হলো। বৌ-ভাতের দিন যাওয়ার জন্য পাত্রপক্ষ যতীনদাকে খুব পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তিনি জানালেন, ওটি হবে না। আপনি আমার টাকা দিয়ে আমাকে খাওয়াবেন, তার জন্যে আমিই আপনাকে আবার বাহবা দেব, এ আমার দ্বারা হবে না।

এমন স্পষ্টবাদী সপ্রতিভ চরিত্র দুর্লভ। সেইজন্যই তিনি পেনসনের কথায় বড়ো আঙুল দেখাতে পেরেছিলেন। আপন মনুষ্যত্বকে খর্ব করেন নি। বুঝি, যারা রোগজর্জর, অক্ষম, সহায়সম্বলহীন, উপেক্ষিত, তাদের জন্য সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক সহায়ক ব্যবস্থা কিছু থাকা উচিত। কিন্তু কোনরূপ বাছবিচার না করে ঢালাও পেনসনের ব্যবস্থা বৈপ্লবিক আদর্শ এবং আত্মমর্যাদার প্রেক্ষিত থেকে কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

এর ফলশ্রুতি যা হবার তাই হয়েছে। বৈপ্লবিক অথবা গান্ধীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কোন দিন যুক্ত ছিল না, গ্রেপ্তার হওয়া দূরের কথা, এমন শত শত মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনসন ভোগ করছে। এমন

কি যারা সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের চর হিসাবে স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এসেছে, এমন কিছু সংখ্যক গোয়েন্দাও ঐ পেনসান পাচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দাদারা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞান-পত্র দিয়েছেন। আদর্শের প্রত্যয়হীন মানুষেরা এমনি ভাবেই নিজেদের অবনমিত এবং নিন্দার্হ করে তোলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনায় নানান যুক্তি—আসলে কুযুক্তি—শুনতে পেয়েছি। একজন বলেছিলেন, আমরা যদি টাকাটা নাও নিই, তাহলে কি আপনি মনে করেন টাকাটা খরচ হবে না? একভাবে না একভাবে খরচ হবেই। আরেক জন বলেছিলেন, এটাকে ভিক্ষাবৃত্তি বলছেন কেন? এটা তো আমাদের অধিকার। কোন্ মহৎ অবদানের জন্য এই অধিকার জন্মায় জানি না; শুধু এইটুকু জানি, ভিক্ষাবৃত্তিকে যে নামেই সোহাগ করি না কেন, তাতে তার চরিত্র বদলায় না।

কয়েক বছর বাদে মণিভূষণ ভট্টাচার্যের একটি কবিতায় ('দধিচী') আমার মনোভঙ্গির প্রতিফলন আবিষ্কার করে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। মণিভূষণ তাঁর চরিত্র রূপায়ণের সুনিপুণ দক্ষতায় এবং শব্দের ব্যঞ্জনাময় দ্যোতনায় বিপ্লবের চিরন্তন প্রবাহে স্থিত একটি অবিনশ্বর চরিত্র উপহার দিয়েছেন। দৈন্যক্লিষ্ট গ্রামীণ পরিবেশে মানবিক ভাবনায় ব্যাকুল এই মানুষটি নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্প রচনা করে; গোড়ায় সেসব নিয়ে বড়ো আশায় সে তার এক সময়ের জেলবন্ধুদের—তারা এখন মন্ত্রী—সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো। কিন্তু ইতিমধ্যে বেনিয়াগিরিতে অভ্যস্ত হয়ে-ওঠা প্রাক্তন বন্ধুদের তো অজুহাতের অভাব নেই। তা সত্ত্বেও অপ্রতিরোধ্য উদ্যমে তার প্রকল্পগুলো রচিত হতে থাকে। ক্লান্ত চোখে কখনও কখনও বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে। কবিতাটির শেষাংশ এই প্রকার:

> তারপর একদিন দুপুরবেলা কয়েকজন তাঁকে জোর করে মহাকরণে
> ধরে নিয়ে গেলো। সেক্রেটারিসাহেব ডান হাতে রিসিভার
> নিয়ে বড়োবাজারী বন্ধুর সঙ্গে মস্করা করছিলো,
> ভুরু কুঁচকে বাঁ হাতে একটা ফর্ম্ এগিয়ে দিলো,

ছেলেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে বললো,—

'নৃপেনদা,' সই করুন ?

ফর্মটা চোখের খুব কাছে নিয়ে আগাগোড়া পড়ে তিনি

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর অপাপবিদ্ধ অস্থি

কেঁপে উঠলো, হাঁপানির টানের সঙ্গে চোখ দুটো

ঠিকরে বেরিয়ে এলো, কলম ছুঁড়ে দিয়ে ফর্মটা ফচাফচ্

ছিঁড়ে সেক্রেটারির মুখে ছুঁড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—

'স্কাউণ্ড্রেলস, আমাকে এভাবে ইনসাল্ট করার মানে কি,

আমি প্রাক্তন বিপ্লবী নই, এখনো বিপ্লবী।'

সেই তাম্রশাসিত বেনিয়া অপরাহ্নে তাঁর বিশাল

কুঁজো ছায়াটার সঙ্গে প্রচণ্ড রাগে গরগর করে উঠলো

আগামী দিনের ভারতবর্ষ,

তিনি দুটো ঝোলা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে

বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগের টাই এবং স্টিয়ারিং-এর

ঘূর্ণায়মান চালাকি আর লাম্পট্য ভেঙে ধীরে ধীরে

শহীদ মিনারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

এই দধিচীর প্রতিশ্রুতি ছিল আমার কালের আন্তর প্রেরণায়। কিন্তু, আমি হতে পারি নি, আমরা হতে পারি নি।

ত্রৈলোক্য মহারাজ (চক্রবর্তী) স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের সামাজিক রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে একদা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, রাষ্ট্র-ক্ষমতা তো বিপ্লবীদের হাতে আসেনি, এসেছে অন্য মানুষদের হাতে। সুতরাং—। তাঁর নৈরাশ্যকে একটি প্রতি-প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বিচার করা যেতে পারে। বিপ্লবীরা কি সত্যসত্যই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল অথবা গ্রহণ করার মত বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন ? তাঁরা কি নিজেদের শক্তিকে এমন পর্যায়ে উন্নীত ও সংহত করতে সমর্থ হয়েছিলেন যেখান থেকে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের অথবা জাতীয় নেতৃবৃন্দকে

তাঁদের মতামতকে মান্যতা দান করার জন্য বাধ্য করতে পারতেন? স্পষ্টতই পারেন নি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বাহ্নে এবং প্রাক্কালে দীর্ঘস্থায়ী আলাপ আলোচনার কোন পর্বে কোন পক্ষই—না জাতীয় নেতৃবৃন্দ, না সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী—বিপ্লবী দলগুলোর মতামত যাচাই করার প্রয়োজন অনুভব করে নি, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। অথচ, বিষয়গত বিচারে, এ কথা দাবি করার যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ ছিল যে, স্বাধীনতার পূর্বাহ্নে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধান্তে বিপর্যস্ত ইংরেজদের ঐ বৈপ্লবিক সম্ভাবনাময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করার শক্তির অভাব ঘটছিল।

ঐ ক্রান্তিলগ্নে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিপ্লবী তত্ত্ব ও নেতৃত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ হারিয়ে যায়। এটা বাস্তব সত্য; আত্মগত দিক থেকে এই ঘটনার কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

একথা সত্য যে, প্রথম আমলের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ প্রবল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে, আত্মগোপন করে, দলীয় সংগঠন গড়ে তুলেছেন; এবং তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে জেলখানার অবরুদ্ধ পরিধিতে। ফলে, প্রকাশ্য নিয়ম-মানা রাজনীতির যে ব্যবহারিক সুবিধা, গণমত ও গণমাধ্যমের যে সমর্থন, তা তাঁরা কোনদিন পান নি। তাই, জাতীয় নেতৃবৃন্দের সমান্তরাল নেতৃত্ব গড়ে ওঠার অবকাশ কম ছিল। তা ছাড়া, অন্য একটা প্রতিবন্ধকতার অবদানও বিচার্য। তাঁরা কলেজীয় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন অথবা তা বর্জন করেছেন। সুতরাং কলেজীয় পরিবেশে বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তাধারার যে আবর্ত, তাতে অবগাহন করার সুযোগ ছিল না এবং মানুষের বিচিত্রগামী ভাবাদর্শের সংঘাত মুখ্যত তাঁদের অপরিচিত থেকে গেছে। অথচ, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় কৃতবিদ্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাতে ছিলেন সতত সঞ্চরণশীল। তাঁদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বিপ্লবী নায়কগণের হীনমন্যতার বোধে সঙ্কুচিত হওয়া অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর নয়। এ কারণেই সম্ভবত তাঁরা কোন কোন পর্বে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের—যথা সুভাষচন্দ্র বসু

অথবা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছেন, সমান্তরাল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হন নি। গণ-আন্দোলনের ভিত্তিতে প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার পথে সমান্তরাল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সময় যখন এলো, তখন রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে তাঁরা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। অর্থাৎ, নতুন পরিস্থিতিতে বেমানান।

শুনেছি, অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনুশীলন সমিতির পুলিন দাস বিপ্লবী কর্মীদের গান্ধী-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার বিরুদ্ধে ছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর একাধিকবার বিচার-বিতর্ক হয়, কিন্তু গান্ধীজী তাঁকে স্বমতে আনয়নে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পুলিন দাস, দলীয় ঐতিহ্য অনুসারে, সমান্তরাল বিপ্লবী আন্দোলন অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন ; কিন্তু তাঁর সহকর্মীবৃন্দ জন-সংযোগের সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় গান্ধী-আন্দোলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। আজ স্বাধীনতার জন্ম-কালীন এবং স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতির অধোগামী চরিত্রের কথা বিবেচনা করলে মনে হয়, সেদিন পুলিন দাসই সঠিক পথনির্দেশ করেছিলেন, তাঁর সহকর্মীরা নয়। তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর এবং অনুসৃত হলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবের চারিত্র বৈশিষ্ট্য অন্য প্রকার হতো। সে পথে সমান্তরাল বিপ্লবী নেতৃত্ব জাতীয় পরিধিতে নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ করত।

আত্মপ্রকাশ করেও ছিল স্বাধীনতা লাভের অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই, যখন দ্বিতীয় প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু, সেই নেতৃত্বের বর্তমান পরিণতি এমন মর্মান্তিক ও দুঃখজনক যে, সন্দেহ জাগে সাম্যবাদী বিশ্ব বিপ্লবের আদর্শে তারা আদৌ স্থিত কিনা। কয়েক বছর আগে 'শব্দের তলোয়ার' নামে একটি রাজনৈতিক ছড়ার বই—'রোদের ছড়া ক্রোধের ছড়া এবং দীপ্ত বোধের ছড়া'—উপহার পেয়েছিলাম। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল ভারতবর্ষের খাঁটি কম্যুনিস্টদের উদ্দেশে। উৎসর্গ পত্রটি পাঠ করে সেদিন অতিশয় আনন্দ লাভ করেছিলাম ; কারণ, বিচক্ষণ তরুণ সংকলক

নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে আমরা সত্যিকারের কম্যুনিস্ট হতে পারি নি, আমাদের নেতৃবৃন্দ হতে পারেন নি। বিপ্লবের দধিচী আদর্শ আমাদের জীবনে স্বীকৃত নয়।

নয় যে মার্ক্সবাদী দলগুলোর ব্যবহারিক কার্যক্রম অনুধাবন করলেই তা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। গণসংগ্রামকে ভেতর থেকে প্রবলতর প্রখরতর করার উদ্দেশ্যে সংসদে প্রবেশ—গোড়ায় তত্ত্বগত যুক্তি ছিল এই; অর্থাৎ, বিপ্লবের মহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দরুন একে একটা প্ল্যাটফরম বা হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা। কিন্তু যা শুধুই মীনস্ বা উপায় রূপে পরিগণিত হওয়ার কথা, আজ তাই পরমার্থ। বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা যেসব প্রতিষ্ঠানের উপর দাঁড়িয়ে আছে—লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধান সভা, ইত্যাদি—তাতে অধিক সংখ্যক আসন লাভ করাই মার্ক্সবাদী দলগুলোর একমাত্র লক্ষ্য। দলগুলো সংবৎসর লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা, পঞ্চায়েত ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচন নিয়েই কর্মব্যস্ত থাকে। এই ব্যস্ততার মধ্যে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া এবং সে পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়ার অবসর অথবা সুযোগ কোথায়? মার্ক্সবাদী বৈপ্লবিক তত্ত্ব এবং এদের ব্যবহারিক কার্যক্রমের মধ্যে আজ আসমান-জমিন ফারাক। অন্য কথায়, রেভল্যুশনারি প্র্যাকটিস বা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে এই দলগুলোর বিচ্ছেদ নিরঙ্কুশ এবং সম্পূর্ণ। সেজন্য এদের ব্যবহারিক রাজনীতি ক্যাডার বা কর্মী পুনর্বাসনের রাজনীতি; আর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিছক কিছু পাইয়ে দেবার আন্দোলন।

সুতরাং এই নেতৃত্বকে বৈপ্লবিক তত্ত্বের প্রেক্ষিত থেকে চরিত্রহীন ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। আসলে সমস্যার মূল আরও গভীরে। এই সব মার্ক্সবাদী দল ধনবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চিরস্থায়িত্বের মর্যাদা দান করতে আরম্ভ করেছে, এবং ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে, এরই চৌহদ্দির মধ্যে, কিছু কিছু সংস্কার ও আর্থিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক

উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। সুতরাং, এদের আন্দোলন মূলত সংস্কারবাদী আন্দোলন। সম্প্রতি অধ্যাপক পল সুইজিও দেশ বিদেশের কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোকে সংস্কারবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী কালে ধনতন্ত্রের বিস্ময়কর বিকাশ ও রূপান্তর যেমন সত্য, তেমনি সত্য কম্যুনিস্ট দলগুলোর আত্মসংকোচন। ইউরোকম্যু-নিজমকে সংশোধনবাদই বলি আর সংস্কারবাদই বলি, তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না; এরও উৎপত্তি, ধনবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অমোঘ বলে গ্রহণ করবার মনোভঙ্গি থেকে। এভাবে দেশে দেশে সাম্যবাদের সীমা চিহ্নিত হয়ে যাওয়ায় বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিকতা এবং বিপ্লবের পথে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ও শ্রমিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, এইসব তত্ত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মার্ক্সবাদের সম্পদ আন্তর্জাতিকতা ও বিপ্লবের আদর্শ, বিপ্লবের চিরন্তনতার আদর্শ, যদি অস্বীকৃত হয়, তা হলে মার্ক্সবাদের আর অবশিষ্ট কি থাকে? কি থাকে আমার বিপ্লবী চরিত্রের, আমার মনুষ্যত্বের?

মনে হয় থাকে না। আমার মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা ইওরো-কম্যুনিজমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বিশেষ তৎপর। জিজ্ঞাসায় উদ্বেল হই, দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখার সময় কি হয় নি এখনো? আজও চমৎকার? যৌবনে সমস্ত বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সীমানায় নিজেকে প্রসারিত করে আপন ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করার শিক্ষা পেয়েছিলাম; দিয়েছিলেন মার্ক্সবাদী নেতৃবৃন্দই। সে পাঠ নেতৃবৃন্দ নিজেরাই আজ ভুলে গেছেন। অনেক সময় সবিস্ময়ে ভাবি, মার্ক্সবাদীদের হাতেই কি মার্ক্সবাদের মৃত্যু প্রত্যাসন্ন? এই প্রশ্নের জবাবে 'দীপ্ত বোধের' মন্ত্রগুলো গর্জন করে উঠে: মার্ক্সবাদের চিরন্তন বৈপ্লবিক আদর্শের আবেদন তো অবিনশ্বর, বিশ্বজনীন; তার লক্ষ্য, সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে শোষণ-অত্যাচারহীন সত্যিকারের মানবিক সমাজ সৃষ্টি, মানবিক সংস্কৃতি নির্মাণ। মহাকালের কোন বিন্দুতে এই সমাজ অস্তিত্বশীল হবে কি না জানি না, কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে সে দিকে ধাবমান থাকায়ই তো মানুষের মনুষ্যত্ব, তার অভিযানের ঐশ্বর্য।

কেউ যদি আর পথ চলতে না চায়, থেমে যাক সে ; কেউ যদি কক্ষপথ পরিত্যাগ করতে চায়, সে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করুক সে ; আবার এই আদর্শ নিয়ে কেউ যদি বেনিয়াগিরিতে মত্ত হয়, হোক সে। আমি হব না। আমি আমার স্বপ্ন বিক্রি করব না। আমি দাঁড়াতে শিখেছি, আমি দাঁড়িয়ে থাকব ; না, আমি দাঁড়িয়েও থাকব না। আমি হাঁটব, কবির সঙ্গে হাঁটব। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্ত্রের সঙ্গে হাঁটতে থাকব ঃ

প্রতিদিন তোমার জন্মদিন মৃত্যুকে পার হয়ে যাওয়ার
জন্য, তোমার বিষণ্ণতাকে পার হয়ে যাওয়ার জন্য, এক
নতুন জন্মের প্রতীক্ষা যা তোমার—তোমার স্বপ্নের—
তোমার মন্ত্রের পরিপূর্ণতা।

তুমি জেগে থাকো। নিজেকে কঠিন করো। তুমি
হাঁটো। সামনে ....যতদূর চোখ যায়